ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana®
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম : ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ॥ ২৫ পৌষ, ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ১০ জানুয়ারি ২০১১ ॥ Website : www.eswastika.com

রামমন্দিরের জন্য পাথর কাটার কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অযোধ্যায় রামজন্মভূমি নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চের রায় দানের পর পরিস্থিতির বদল হয়েছে। মন্দির তৈরির জন্য পাথর কাটার যে কাজ এতদিন বন্ধ রাখা হয়েছিল

তা আবার শুরু হবে বলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি অশোক সিংহল জানিয়েছেন। আগামী এক মাসের মধ্যেই এই কাজ শুরু হবে। ১৯৯০ সালে অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণের জন্য পাথর কাটার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু ২০০৭-এ তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেছেন, রামজন্মভূমি ন্যাস মন্দিরের যে মডেল তৈরি করেছে, সেইমতো মন্দির নির্মাণের জন্য ৫৫ শতাংশ পাথর কাটা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে এবং প্রায় ২২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। চাঁদা হিসেবে সওয়া আট কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। যার সুদ বেড়ে এখন হয়েছে মোট ২২ কোটি টাকা। সেই সুদের টাকাতেই এই কাজ হয়েছে।

হুরিয়ত নেতার স্বীকারোক্তি

কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নিহত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে দেশের কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দলগুলি যখন কাশ্মীরে ভারতীয় সেনার ভূমিকায় সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিচ্ছে তখনই শীর্ষ হুরিয়ত নেতা আবদুল গিলানী ভাট শীর্ষ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের মৃত্যুর জন্য আভ্যন্তরীণ কলহকেই দায়ী করেছেন। গত ২রা জানুয়ারি শ্রী ভাট স্পষ্টতই জানান, আবদুল ঘানি লোন এবং মৌলবী ফারুক সেনাবাহিনীর গুলিতে মারা যাননি, মারা গিয়েছেন নিজেদের লোক অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দ্বারাই। আবদুল ভাট ওইদিন শ্রীনগরে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর আরও মন্তব্য, 'সবাইকে সত্যিটা জানানোর সময় এসেছে।' আরও উল্লেখ্য, ভাটের সঙ্গে ওই একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গুলিতে নিহত আবদুল ঘানি লোনের পুত্র বিলাল লোন এবং মৌলবী ফারুকের পুত্র মীরওয়াজ ফারুক। তাঁরাও শ্রী ভাটের এহেন বক্তব্যের কোনও প্রতিবাদ করেননি। প্রসঙ্গত, ১৯৯০ সালে মৌলবী ফারুকের এবং আবদুল ঘানি লোনের মৃত্যু হয় ২০০২ সালে।

মৌলবী ফারুক

আবদুল ঘানি লোন

বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী ভাট আরও বলেন, 'আমাদের প্রথম দরকার নিজেদের সম্বন্ধে অন্তত সত্য কথাটা বলা। মিথ্যাকে আশ্রয় করে আমরা কোনও আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবো না।' ভাটের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে যায় যে শুরু থেকেই একটা স্বার্থান্বেষী কর্মপ্রক্রিয়াই ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের লক্ষ্য। যে কারণে আবদুল গিলানী ভাট বলেছেন, "চিন্তাবিদদের শবযাত্রা করিয়েই শুরু হয়েছিল এই আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের বলি হন অজস্র চিন্তাশীল মানুষ।" তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে ভাট বলেন, জম্মু-কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের উচিৎ আত্মসমালোচনা করা এবং নিজেদের মূর্খামির মূল্য দেওয়া।

নিহত শিক্ষাবিদ আবদুল আহেদ ওয়ানি-র স্মরণে জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (জে কে এল এফ) এই আলোচনা চক্রটির আয়োজন করে। প্রসঙ্গত, ১৯৯৩-এর ডিসেম্বরে জে কে এল এফ সমর্থক আবদুল ওয়ানি আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান। শ্রী ভাট এজন্য স্পষ্টতই কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের রেষারেষিকেই দায়ী করেন। পাশাপাশি বলেও দেন, 'ভারতীয় ফৌজ তাঁকে কখনওই হত্যা করেনি।'

কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যেভাবে পাকিস্তানের মদত নিচ্ছে, প্রকারান্তরে তার সমালোচনা করতেও ছাড়েননি শ্রী ভাট। সেইসঙ্গে হুরিয়ত শীর্ষ নেতা ইউসুফ আলি গিলানীর সমালোচনা করে বলেছেন, "গিলানী সাহেব ভারতীয় সাংসদদের সঙ্গে যখন দেখা করলেন তখন ঠিক আছে, অথচ যখন আমরা এটা করি, আমরা হয়ে যাই বিশ্বাসঘাতক!"

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ব্যাপারে গোয়েন্দারা বহু আগেই কেন্দ্রকে অবহিত করেছিলেন। কিন্তু দলের এবং শরিকদের মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের চাপে কেন্দ্র এর সুযোগ নিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

'পরিবর্তন' কি পরিবর্তন আনবে?

গুপ্তপুরুষ।। কথায় আছে, 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ'। অর্থাৎ হাতে ক্ষমতা পেলে শাসকমাত্রই কমবেশি অত্যাচারী হয়। কথাটা এখন অসংখ্য মানুষ ঘরোয়া আলোচনায় বলছেন। চলতি নতুন বছরের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে রাজ্যে শাসন ক্ষমতার পালা বদল হতে চলেছে। সাড়ে তিন দশক টানা ক্ষমতায় থাকা বামফ্রন্ট সম্ভবত বিদায় নিতে চলেছে। কিন্তু তার পরিবর্তে যে দল বা জোট শাসন ক্ষমতায় আসবে তারা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে কতটা সুশাসন দিতে পারবে? রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনেও কি পরিবর্তন আনবে? এই কথাটাই এখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

বামফ্রন্ট (পড়ুন সিপিএম) ৩৫ বছর পশ্চিমবঙ্গে একচেটিয়া রাজত্ব করেছে। ভারতের কোনও রাজ্যেই এতবেশি সময় একটি রাজনৈতিক দলের জোট টানা শাসন ক্ষমতায় থাকেনি। নিঃসন্দেহে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতে এটি একটি রেকর্ড। এতবড় একটা সুযোগ পেয়েও বামপন্থীরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই করতে পারেনি। শেয়াল পণ্ডিত যেমন একই কুমির ছানাকে দেখিয়ে প্রতারণা করেছিল তেমনি বামফ্রন্ট সরকার তিন দশক আগেকার ভূমি সংস্কার ও

(এরপর ৪ পাতায়)

সরকারের ভ্রান্ত অর্থনীতিই মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। একটি বেলার মধ্যে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ৩৫ টাকা থেকে এক লাফে ৬০ টাকা হয়ে যাওয়ায় টনক নড়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের। সরকারের তরফে অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী উভয়েই একাধিক বিবৃতি জারি করেছেন। অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাসও দিয়েছেন। কিন্তু জিনিসপত্রের উর্ধ্বমুখী দাম কমার সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। শীতের মরসুমে যেখানে সবজি আনাজপত্রের ভরা বাজার থাকার কথা সেখানে বাজারে সবজি-র কেন আকাল দেখা দিল তা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা যথেষ্ট সন্দিহান। এমনকী যাঁরা এতদিন বিশ্বাস করে আসছিলেন অসাধু ব্যবসায়ী ও সরকারি এনফোর্সমেন্ট বিভাগের গাফিলতিতেই বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে পরিকল্পিতভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো হচ্ছে তাঁরাও এখন বলছেন— গলদটা গোড়ায়। যে কারণে ইউ পি এ সরকার ২০০৪-এ ক্ষমতায় আসার পরই জিনিসপত্রের দাম উর্ধ্বমুখী।

এর প্রতিবিধান হিসেবে ষষ্ঠ বেতন কমিশনে সুপারিশ কার্যকর করা ছাড়া আর কোনও কাজটাই করেনি ইউ পি এ সরকার। লক্ষণীয় ২০০৬ সালে জিনিসের দাম যা ছিল, ২০১০ সালের শেষে সেই জিনিসের দামই প্রায় দ্বিগুণ, কোনও ক্ষেত্রে দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে গেছে। হলুদের দাম তো প্রায় ছ'গুণ হয়ে গেছে। আরও লক্ষণীয় যে দ্রব্যের একবার মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, ফসল যতই ভাল হোক না কেন পরবর্তী সময়ে তার মূল্য কিন্তু একেবারেই কমেনি। অর্থনীতিবিদরা প্রশ্ন তুলছেন, যখন চিনির কেজি ৫০ টাকায় পৌঁছেছিল, তখনই খবরের কাগজে চোখ বোলালে দেখা যেত, দাম না পেয়ে আখচাষীর আত্মহত্যার নিত্যনৈমিত্তিক খবর। এর পেছনে সরকারের এনফোর্সমেন্ট বিভাগের একটা গাফিলতি নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু অর্থনীতিবিদ থেকে রাজনীতিজ্ঞ— প্রত্যেকেই মনে করছেন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারেরও একটা ভোটের তাগিদ নিঃসন্দেহে রয়েছে। সুতরাং চিনির দাম ৫০ টাকা অথচ দাম না পেয়ে আখ-চাষীর আত্মহত্যা— এটা যে ভোটের রাজনীতিতে বিলক্ষণ ক্ষতিকারক তা কংগ্রেস ভালভাবেই বোঝে। অথচ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সরকার চেষ্টা করেও দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। পর্যবেক্ষকদের মতে, এটা ঠিক যে ভোটের আগে অর্থসংগ্রহের কারণে অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যা টাকা-পয়সা নিয়েছিল কংগ্রেস ও তার সহযোগীরা, তার প্রতিদানে 'ঋণশোধ' করার একটা ব্যাপার আছে নিশ্চয়; কিন্তু ভোটের স্বার্থ বিঘ্নিত করে কোনও সরকারই এই ঋণশোধ করতে চাইবে না। সুতরাং তাদের সিদ্ধান্ত, এনফোর্সমেন্ট বিভাগের ব্যর্থতার পাশাপাশি সরকারের আর্থিক নীতির দৈন্যদশাও এই মূল্যবৃদ্ধিজনিত কারণে ফুটে উঠেছে।

অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন— মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে সরকার ষষ্ঠ বেতন কমিশন এনে সরকারী কর্মচারীদের বেতন-বৃদ্ধিকেই এর প্রতিষেধক হিসেবে ঠাওরেছেন। এর ফলে হয়তো বেসরকারী উচ্চ-বেতনভোগীর মাইনেও কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু গরীব ও মধ্যবিত্ত অধিকাংশ মানুষের আয় সেভাবে বাড়েনি। পেনশনভোগীরাও অসুবিধায় পড়েছেন দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধিতে। আর এর প্রভাবেই মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। নষ্ট হয়েছে দেশীয় অর্থনৈতিক বুনিয়াদটাই। অর্থনীতিবিদরা এও মনে করছেন, দেশের অর্থনীতির ওপর চাপ বাড়ানোর জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কূটনৈতিক ব্যর্থতাও। কারণ ২০০৮-এ আর্থিক মন্দার পর সারা বিশ্ব যখন নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটে পড়েছিল তখন এদেশের সংস্কারমুখী অর্থনীতিতে

(এরপর ৪ পাতায়)

একনজরে ২০০৬ থেকে ২০১০ পর্যন্ত প্রতিবছর মূলবৃদ্ধি

দ্রব্য	ডিসেম্বর '০৬	ডিসেম্বর '০৭	ডিসেম্বর '০৮	ডিসেম্বর '০৯	জানুয়ারি '১০	ডিসেম্বর '১০
চাল	১৪.৫০	১৫.৫০	২১.৫০	২০	২০	২৪
চিনি	২১	১৭	৩৮	৩৮	৪২	৩৪
অড়হর ডাল	৩২	৪৪	৫১.৫০	৮৯	৮৯	৬৫
ছোলার ডাল	৪১.৫০	৩৪	৩২.৫০	৩৪	৩৪	৪৫
মুগ ডাল	৪৬.৫০	৩৬	৪৫.৫০	৮৫	৮৯	১২০
নুন (আয়োডাইজড)	৮.৫০	৯	১০	১১	১১	১১
আটা (১০ কেজির প্যাকেট)	১৪৮.৫০	১৪৮	১৫৬	১৮৮	১৮৮	১৮০
ধারা রিফাইন তেল	৬৪	৬৭	৮৮	৭৫	৭৫	৮৩
হলুদ (২০০ গ্রাম)	৮.৫০	৮.৫০	১৭.৫০	২০	৩০	৪৯
ধনে (২০০ গ্রাম)	৯	১১.৫০	২৮	৩০	২৩	২০
আলু	৬-৭	৮-১০	৯-১২	১০-১৪	১০-১৪	১৫-২০
পেঁয়াজ	১৪-১৫	১৪-১৫	২০-২৫	২০-২৫	১৪-১৯	৮০
মুরগীর মাংস	৭০-৮০	৮০-৯০	৯০-১০০	১০০-১২০	১১০-১২০	১৩০-১৫০
পাঁঠার মাংস	১৪০	১৫০-১৬০	১৮০-২০০	২০০-২২০	২০০-২২০	২২০-২৬০

*উপরোক্ত প্রত্যেকটি দ্রব্যের মূল্য ভারতীয় টাকায় এবং প্রতি কেজির হিসেবে তা নির্ধারিত হয়েছে। প্রত্যেকটি তথ্যই মিলেছে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার সূত্রে। কলকাতার বাজারের দামের তুলনায় উপরোক্ত দ্রব্যের দাম কিছুটা কম কারণ তা দিল্লীর পাইকারী বাজারের।

নিজদোষেই বুদ্ধদেববাবুরা আজ ধ্বংসের পথে

নিশাকর সোম

রাজ্য রাজনীতি

এখন রাজ্য-রাজনীতিতে 'পত্র' নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম পত্র— কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম লিখেছেন এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-কে। এই চিঠির প্রাপ্তি নিয়ে বেশ কিছু কথা চালাচালি হয়েছিল। চিঠি জি পি ও-তে আটকে পড়েছিল দু'দিন। যদিও চিঠিটি স্পীড পোস্টে পাঠানো হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চিঠি। সেই চিঠির যদি এই দশা হয় তবে সাধারণ লোকের চিঠির দশা কী হয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। এরকম ঘটনা বিরল নয় যে বেকার যুবকের চাকরির ইন্টারভিউ অথবা চাকরির পরীক্ষাগুলির অ্যাডমিট কার্ড নির্ধারিত তারিখের একমাস পরেও পৌঁছায়। অ্যাডমিট কার্ডের ডুপ্লিকেট পাওয়া যায়, কিন্তু চাকরির বিকল্প তো পাওয়া যায় না। একটি বেকারের জীবনে ডাক-বিভাগের দয়াতে অন্ধকার নেমে আসে। ডাক-বিভাগ চিদাম্বরম-এর চিঠির ক্ষেত্রে ক্ষমা চেয়ে ইতি টেনেছে। অথচ তাদের গাফিলতিতে কত বেকারের জীবনে ইতি টেনে দেয়— সে-বিষয়ে কে প্রতিবাদ করে? আর কে-ই বা ক্ষমা চায়?

প্রথমেই বলা দরকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম-এর চিঠি এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছানোর আগেই সাংবাদিকদের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। কি করে? কেন? তার জন্য খুব বেশি মগজের এক্সারসাইজের প্রয়োজন হয় না। এটি কোন্ সূত্রে কার স্বার্থে তা' সকলেই বুঝে যান। এই সূত্র ধরে আরও বলা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের কত গোপন তথ্যও তো তাহলে ফাঁস হয়ে 'বিক্রি' হয়ে যেতে পারে? তা সে সরকারের ব্যর্থতা বা প্রতিপক্ষকে টাইট দেওয়া—যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন।

২০১৪ সালেই কংগ্রেস-এর কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিটি রাজ্যে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা ইউ পি এ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মধ্যেই বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় এরাজ্যে তৃণমূলকে তুষ্ট করা ছাড়া কংগ্রেসের আর কোনও বিকল্প নেই।

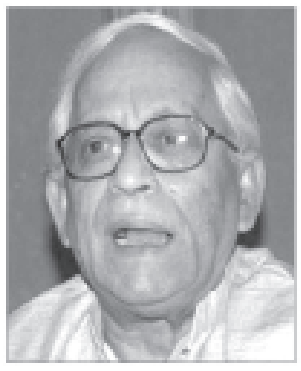

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চিঠিটি বস্তুত সংবিধানের ৩৫৫ ধারা প্রয়োগের সামিল। চিঠিতে চিদাম্বরম কি বলেছেন? ওই চিঠিতে রাজ্যে বিরোধী দল তথা তৃণমূলের নিহত এবং আহত কর্মীদের সংখ্যা আছে। সর্বোপরি আছে সিপিএম-এর হার্মাদবাহিনী মৌথবাহিনীর সঙ্গে মিলে জঙ্গলমহল এলাকায় এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে বলে অভিযোগের তীর। চিঠিতে চিদাম্বরম হার্মাদ কথাটিতে উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুঝিয়েছেন, এটি তিনি যেমন সংবাদ পেয়েছেন তেমন লিখেছেন।

এই চিঠির জবাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপত্তি জানিয়ে বলেছেন— (১) নিহত ও আহতের সংখ্যা সঠিক নয়, (২) 'হার্মাদ' শব্দটিকে মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে 'ন্যাস্টি' 'কুৎসিত' বলা হয়েছে।

বুদ্ধবাবুর প্রত্যুত্তর সম্পর্কে বলা যায়— (১) রাজ্যে যে খুনোখুনি চলছে— তা' বন্ধ করতে ব্যর্থ রাজ্য-প্রশাসন। এমনকী শাসকদলের কর্মীরাও নিহত হচ্ছেন। এ কেমন শাসকদল-এর শাসন? বুদ্ধবাবুর চিঠিতে বলা হয়েছে যে তৃণমূল-মাওবাদীদের প্রকাশ্য আঁতাত আছে। এটি ভয়ঙ্কর কথা— কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারের অংশীদার পার্টির সঙ্গে মাওবাদীদের যোগ-সাজস— এতো দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বড় ভয়ঙ্কর বিষয়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বুদ্ধবাবুরা এ-কথা বলছেন। তার প্রমাণ-তথ্য-নজির-দলিল পত্রাদি কি কেন্দ্র সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে এবং সে-সম্পর্কে কি শ্বেত-পত্র প্রকাশ করা হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে কেন করা হয়নি?

এত বছর ধরে মাওবাদীদের বাড়তে দেওয়া হলো কেন? সিপিএম তো বলতো রাজনৈতিক ভাবে তারা মাওবাদীদের মোকাবিলা করবে! আসলে মাওবাদী/জঙ্গিরা রাজনৈতিক দাবার বোড়ে। ক্ষমতায় থাকার জন্য সিপিএম, তৃণমূল এদের এ-রাজ্যে ব্যবহার করেছে— করছে করবে। মাওবাদীদের কৌশল হলো একটা রাজনৈতিক দলের কাঁধে ভর দিয়ে 'মুক্তাঞ্চল' (liberated) তৈরি করা। এই মাওবাদীরা ধীরে ধীরে অ-রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সামনে আনছে। বামফ্রন্টের সমস্ত দলেরই মাওবাদীদের সম্পর্কে সহানুভূতি রয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের সাপ্তাহিক-এ অন্ধ্রের মাওবাদী নেতার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আর এস পি তো মাওবাদীদের নিয়েও বৃহত্তর বামপন্থী মঞ্চ গড়তে চায়। আসলে মার্কসবাদের ব্যাখ্যার ফলেই নকশাল-মাওবাদ-এর সৃষ্টি। আর এদের সাহায্য এ-রাজ্যে শাসকদল গ্রহণ করেছেই।

বুদ্ধবাবু লিখেছেন— জঙ্গলমহলে ঘরছাড়া সিপিএম-কর্মীদের শিবির রয়েছে। যদি তাঁরা ঘরছাড়া হন তবে তো তাঁদের ফিরে আসা-কে গ্রামবাসীরা সমর্থন করবেন। আসলে জনগণের উপর ভরসা না করে বন্দুকের নলের উপরই তাদের আস্থা বেশি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, অন্ধ্র বিধানসভার বিগত নির্বাচনে কংগ্রেস জনযুদ্ধের সীতারামাইয়া গোষ্ঠীর সাহায্য নিয়েছিল— এক থা এক প্রাক্তন নকশাল নেতা তো একটি বাংলা দৈনিকে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন।

যাই হোক, বুদ্ধবাবুদের ফ্রন্টের শরিকরাই একাধিকবার বলেছেন যে— সিপিএম বন্দুক দেখিয়ে সমস্ত দলকে দাবিয়ে রাখছেন। এ কথাতো সত্যি, নির্বাচনে বিরোধীরা যাতে ভোট দিতে না পারেন তার জন্য আপনারা ম্যাসলম্যানদের কাজে লাগিয়েছেন। এখনতো তা নাকি ফিরে আসছে— ব্যুমেরাং হচ্ছে।

বুদ্ধবাবুরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে, তৃণমূল যা অভিযোগ আনবে সেটাই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতারা মেনে নেবেন। কারণ— (১) এরাজ্যে তৃণমূলের অনুসারী হয়ে ক্ষমতার হিস্যা নেওয়া। (২) কেন্দ্রে কংগ্রেস নিশ্চিহ্নরা, কারণ— স্পেকট্রাম দুর্নীতি, পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবি। যে দাবিকে সমর্থন করে কেশবরাও সমেত অন্ধ্রের সমস্ত কংগ্রেসি সাংসদ সংসদ থেকে পদত্যাগের হুমকি দিয়েছেন। ২০১৪ সালেই কংগ্রেস-এর কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিটি রাজ্যে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা ইউ পি এ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মধ্যেই বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় এরাজ্যে তৃণমূল-কে তুষ্ট করা ছাড়া কংগ্রেসের আর কোনও বিকল্প নেই।

বুদ্ধবাবুরা জেনে রাখুন, কেন্দ্রের মনোভাব ক্রমশ আরও কঠোর হচ্ছে।

চিদাম্বরম-বুদ্ধদেব পত্রযুদ্ধ প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, "জঙ্গল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। টাকাটা তিন ভাগ হচ্ছে। একভাগ কেন্দ্রীয় বাহিনী পাচ্ছে, একভাগ রাজ্য-বাহিনী ও আর একভাগ হার্মাদবাহিনীর হাতে যাচ্ছে।" কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘটনার তলস্ত করে ফলাফল প্রকাশ করা উচিত।

পরিশেষে এ কথা বলতে চাই, কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার (এস আই বি) মাধ্যমে রিপোর্ট সংগ্রহ করছেন না কেন? শরিকদলের হাতে তামাক খেয়ে বুদ্ধবাবুদের হাতে প্রচারের তথ্য তুলে দিচ্ছেন কেন? বারবার লিখেছি এবং এখন আবার বলছি এ-রাজ্য এক ভয়ঙ্কর অস্ত্রের লড়াই আসন্ন— মৃত্যুর পথে এগোচ্ছে! কে এই পথকে রুদ্ধ করবে?

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অর্ডিন্যান্স আর একটি নাটক

টেলিকম দপ্তরের টু-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারী চাপা দিতে কংগ্রেস-তৃণমূল জোট নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার তথা ইহার চেয়ারপার্সন সনিয়া গান্ধীর নাটকের যেন বিরাম নাই। এই বিরামহীন নাটকের সর্বশেষ সংস্করণ—অর্ডিন্যান্স। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোটের রাজনৈতিক দলগুলির জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির (জেপিসি)-র দাবি কিছুতেই না মানিয়া সনিয়ার আজ্ঞাবহ মনমোহন সরকার সংসদের একটি পূর্ণাঙ্গ সেশনই খোয়াইয়াছেন। তাহাদের একগুঁয়েমির নীট ফল হইয়াছে রাষ্ট্রের বিপুল আর্থিক ক্ষতি। কত কোটি সেই বিতর্ক অবান্তর। যে কংগ্রেসীরা তাহাদের এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে চাণক্য বলিয়া গর্ববোধ করিতেন, তাহাদের কী জানা আছে যে চাণক্য রাষ্ট্রের অর্থে সামান্য একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া নিজের সামান্য একটি কাজ পর্যন্ত করিতেন না। উদাহরণটি দেওয়ার অর্থ হইল রাষ্ট্রের একটি কানাকড়িও একজন দেশপ্রেমীর কাছে মহামূল্যবান।

যতদিন যাইতেছে জনগণের মধ্যে এই ধারণাই বদ্ধ মূল হইতেছে যে টেলিকম টু-জি স্পেকট্রাম দুর্নীতির সঙ্গে আরও কত কী জড়িত আছে যাহার জন্য কংগ্রেস দলীয় ভাবে মনমোহনের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে যেন কোনওক্রমেই ইহার সংসদীয় তদন্ত না হয়। তাহাতে রাষ্ট্রের যতরকমের ক্ষতিই হউক না কেন।

প্রথমেই কংগ্রেস জে পি সি'-র বদলে পি এ সি'-র মাধ্যমে তদন্তের চাল দেয়। পি এ সি অর্থাৎ পাবলিক অ্যাকান্টস কমিটি সরকারেরই একটি মন্ত্রকের অধীন কনসালটেটিভ কমিটি। ইহার ক্ষমতা নামের মধ্যেই নিহিত। শুধু আলোচনাই যেখানকার কাজ সেইখানে কেবলমাত্র কনসাল্ট করিয়া ইনসাল্ট করিবার মতো ব্যাপারই হইতে পারে—তাহার বেশি কিছু নয়। এই পি এ সি'-র মাধ্যমে তদন্তের প্রস্তাবের আরও একটি কারণ হইল পি এ সি'-র বর্তমান চেয়ারম্যান বিজেপি-রই একজন সংসদ সদস্য মুরলী মনোহর যোশী। তিনি নাকি আবার টু জি কেলেঙ্কারির তদন্ত পি এ সি-তেই করিবার পক্ষপাতি।

এই যোশীজীকে লইয়া বাজারি পত্রিকাগুলি বিজেপি এবং এন ডি এ সদস্যদের মধ্যে বিভাজন ঘটাইবার নানান চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ যোশীজী বিজেপি-র মতের সহিত সহমত ঘোষণা করায় কংগ্রেস ও তাহার লালিত-পালিত পত্র-পত্রিকাগুলিও সমস্যায় পড়িয়াছে। কংগ্রেস দল ও তাহার নেত্রীর সরাসরি অধীন তথাকথিত স্বাধীন সিবিআই-কে দিয়া রাজা-প্রজাদের বাড়ী, অফিস ইত্যাদি জায়গায় কিছু হানা দেওয়াইয়াছে। বাজারি পত্রিকাগুলিও সুর বদলাইয়া বলিতে শুরু করিয়াছিল এইতো সরকার সব কিছুই করিতেছে, তাহা হইলে আবার জে পি সি কেন?

তাহাতেও কিছু না হওয়ায় অর্থাৎ এন ডি এ জোটে ভাঙ্গন ধরাইতে না পারিয়া এখন উত্থাপন করিয়াছে বাজেট অধিবেশনের গুরুত্বের কথা। বাজেট অধিবেশন ভণ্ডুল করিলে তাহা বিজেপি-র পক্ষে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রচারে দৃশ্যতই কংগ্রেস বামদলগুলির সঙ্গে গোপন রফায় আসিবে। বামদলগুলি চিরকালই সবকিছুর বিনিময়ে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসীন থাকায় বেশি গুরুত্ব দিয়া থাকে। এই প্রাপ্তিতে তাহারা জাতীয় আন্দোলনের ঐক্যের পিছনে বহুবার ছুরি মারিয়াছে। এবারেও যে মারিবে না তাহার গ্যারান্টি নাই। ইতিমধ্যেই বামদলগুলি বাজেটের গুরুত্বকে পুঁজি করিয়া কংগ্রেসের সুরেই সুর মিলাইতে শুরু করিয়াছে। অতএব আসন্ন বাজেট অধিবেশনে সার্বিকভাবে বিরোধী দলগুলির মধ্যে বিভাজন আনয়ন করিবার একটি গোপন প্রয়াস শুরু হইয়া গিয়াছে বলা চলে।

এই প্রয়াসটিকে আরও ত্বরান্বিত করিতে আবার অর্ডিন্যান্সের প্রশ্ন বাজারে ছাড়িয়াছে কংগ্রেস দল তাহার পোষ্য পত্র-পত্রিকাগুলির মাধ্যমে।

এই বাজারি পত্রিকার কথাগুলি শুনিতে তো বেশ মধুর। কিন্তু প্রশ্ন হইল জে পি সি গঠন না করিয়া যদি সবকিছু করা যাইতেছে, তাহা হইলে জে পি সি গঠন না করার জেদ ধরিয়া রাষ্ট্রীয় কোষাগারের এই বিপুল ক্ষতি সাধন করা হইল কেন? জে পি সি গঠন করিয়া এইসব পদক্ষেপগুলি লইলেও তো এতগুলি অর্থের অপচয় হইত না? এইসব নাটকের কি প্রয়োজন ছিল? আসলে এই দুর্নীতির সঙ্গে সঙ্গে হয়ত অনেক কিছু বাহির হইয়া পড়িতে পারে। সংসদীয় তদন্ত কমিটির কাছে প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী রাজা কি বলিয়া বসিবে কে জানে? প্রাক্তন টেলিকম সচিব টমাসই বা কী বলিয়া বসিবে তাহার ঠিকানা নাই। শোনা যাইতেছে এই কারণে না কী রাজার বাড়িতে সিবিআই-এর হানার কথা এবং তাহাকে কি কি প্রশ্ন করা হইবে তাহা আগেভাগেই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল? সবই শোনা কথা। তবে যাহা রটে, তাহা কিছুটা বটে। এটাও কী একটা প্রবাদ নহে?

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে কোন দেশের সাহিত্য থেকে আমরা এই ইউরোপে সম্পূর্ণরূপে গ্রীক ও রোমান সেমেটিক এবং জিউস চিন্তাধারার ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ হয়েছি? সেই সত্য, যার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের অভ্যন্তরীণ জীবনকে সুসংবদ্ধ করা— বিশ্বজনীন করা; প্রকৃতপক্ষে সত্যকারের মানুষ হিসাবে পরিণত করা; শুধুমাত্র এই নশ্বর জীবনের জন্য নয়—এক চিরন্তন জীবনের জন্য; যে দেশের সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে এই প্রশ্ন সেই দেশ হলো ভারতবর্ষ।

—দার্শনিক ম্যাক্সমুলার

কোন পথে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি?

তথাগত রায়

পরিবর্তন হবে? নাকি আবার স্থিতাবস্থা, থোড়-বড়ি-খাড়া থেকে খাড়া-বড়ি-থোড়, সেই বুদ্ধ-বিমান গোষ্ঠীর প্রত্যাবর্তন? এই প্রশ্ন আজ সকলের মুখে মুখে। প্রত্যাবর্তন চান এমন কিছু মানুষ নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু তাঁরা মুখ বুজে আছেন। অপরপক্ষে যাঁরা পরিবর্তন চান তাঁরা অনেকটাই সোচ্চার, কিন্তু তাঁরাও জোর দিয়ে বলতে পারছেন না, "পরিবর্তন হবেই"। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মীর পরিস্থিতি বোঝা এবং বুঝে চলা প্রয়োজন।

সিপিএম-এর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার একটি শয়তান, পাপিষ্ঠ সরকার। গত পঁয়ত্রিশ বছরে এরা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের ওপর যা অত্যাচার করেছে এবং যা সর্বনাশ করেছে তা বর্ণনা করার ভাষা এই নিবন্ধকারের নেই। সাধারণ মানুষের স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ এবং এখন প্যাঁচে পড়ে বামফ্রন্টীরা খুব নরম সুরে কথা বলছে বলে কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তাতে এদের পঁয়ত্রিশ বছরের পাপ ধুয়ে যাবে না।

সিপিএম তথা বামফ্রন্টের কীর্তিকাহিনী যাতে আমরা ভুলে না যাই সেইজন্য কিছু মারাত্মক অত্যাচারের ঘটনার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলো। মনে রাখতে হবে, এটি শুধু কিছু ঘটনারই অসম্পূর্ণ তালিকা— এর পরিণতি আলাদা করে আলোচনা করা হয়েছে।

শুধু খুনজখম করে রাজ্যের উপর নিজেদের আধিপত্য কায়েম করা নয়— শ্রমিকদের অদূরদর্শী জঙ্গিপনা শিখিয়ে শিল্পে অশান্তি সৃষ্টি করেছে সিপিএম। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সিপিএম-এর মদতপুষ্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটি নির্বাচনে কারচুপি করার ব্যবস্থা করেছে। সেই সঙ্গে তাদের শিখিয়েছে সরকারী কাজ করার দরকার নেই, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুকুরের মতো ব্যবহার করলেও, বৃদ্ধ স্কুলমাস্টারদের পেনশন বছরের পর বছর ফেলে রাখলেও কেউ কিছু বলবে না। পরিকাঠামোর সর্বনাশ করেছে, স্বাস্থ্যব্যবস্থার সর্বনাশ করেছে। পরিকল্পনার টাকা পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে ব্যয় করে রাজ্যকে সম্পূর্ণ দেউলিয়াপনায় ঠেলে দিয়েছে। নিজেদের পেটোয়া ক্যাডারদের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী পদে নিয়োগ করে শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনাশ করেছে। রাস্তায় নেমে কম্পিউটার রুখেছে, ছাত্রছাত্রীদের ইংরাজি পড়া বন্ধ করে দিয়েছে (কিন্তু জোতি বসুর নিজের নাতনীরা ছোটবেলা থেকে ইংরাজি পড়েছে)।

এইসব কুকীর্তির সম্মিলিত ফল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্পের পলায়ন এবং তার ফলে ক্রমবর্ধমান বেকারী। এই অপবাদ ঠেকাবার জন্য আবার সিপিএম নয়া কৌশলের খেলা খেলেছে— শিল্পপতিদের ডেকে ভোজসভা করেছে;তারা জ্যোতি বসুর পিঠ চাপড়েছেন। আর সিপিএম-এর পেটোয়া সংবাদমাধ্যম লিখেছে, "এবার বোধ হয় সত্যিই কিছু হতে যাচ্ছে, এবার বোধ হয় ঘুরে দাঁড়াবে বাংলা"! হয়েছে অশ্বডিম্ব! হ্যাঁ, আর একটা জিনিস হয়েছে— প্রত্যেক বছর গরমের সময় জ্যোতি বসু অনাবাসী শিল্পপতি ধরে আনার ছল করে সরকারী খরচে বিলাত আমেরিকা বেড়িয়েছেন, দেদার মদ খেয়েছেন, ফুর্তি করেছেন।

কেউ যেন মনে না করেন যে এর ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা যে পতনের দিকে গেছে তা সিপিএম-এর অভিপ্রেত ছিল না। বিলক্ষণ অভিপ্রেত ছিল— কারণ কোনও কমিউনিস্ট কখনও সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি চায় না, সাধারণ মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে খেয়ে পরে বাঁচুক তা চায় না। কমিউনিস্টরা চায় মানুষ সবসময় অভাবে থাকুক, বেকায়দায় থাকুক, যাতে তাদের ঘন ঘন পার্টি অফিসে দৌড়তে হয় এবং পার্টি তাদের কাজের একটু ভগ্নাংশমাত্র করে দিয়ে তাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, মানুষ যাতে পার্টির উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যদি মানুষ খেয়েপরে ভালভাবে সুখেস্বচ্ছন্দে থাকে তা হলে তারা পার্টিকে পাত্তা দেবে কেন?

এখন, মানুষের উপর এইরকম ধোঁকাবাজি চালিয়ে যাবারও একটা সীমা আছে— যার পরে মানুষ প্রকৃত অবস্থা বুঝে বিদ্রোহ করতে আরম্ভ করে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শিল্পস্থাপন করার চেষ্টা সেই বিদ্রোহ ঠেকানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সেই শিল্পস্থাপন করতে গিয়ে যে কাণ্ড হলো, তাপসী মালিকের ধর্ষণ ও হত্যা থেকে আরম্ভ করে ক্যাডারদের পুলিশের পোশাক পরিয়ে নন্দীগ্রামের গণহত্যা, তা সকলেরই জানা। এর বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জী যে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন তাও সবাই জানেন। যেটা বহু মানুষ জানেন না তা হলো, সিঙ্গুরের ব্যাপারে মমতা অনশন করতে গিয়ে মমতা যে রাজনৈতিক অন্ধগলিতে ঢুকে পড়েছিলেন তার থেকে তাকে বাঁচিয়ে ছিলেন বিজেপির রাজনাথ সিং; নন্দীগ্রামে মমতা ঢুকতেই পারছিলেন না, সেখানে যেতে পারলেন কারণ বিজেপি-র আদবানি ও সুষমা স্বরাজ সেখানে গিয়ে তাঁর যাবার রাস্তা তৈরি করে দিলেন।

এর প্রতিদান মমতা দিলেন বিজেপি-কে ছেড়ে কংগ্রেসের হাত ধরে— কারণ মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক।

অতএব এবার সিপিএম-এর রাজনীতির আলোচনা ছেড়ে মমতার রাজনীতির আলোচনায় যাওয়া প্রয়োজন। মমতার রাজনীতি— তৃণমূলের (মমতার ভাষায় 'তিণোমূলের') নয়— কারণ একা মমতার উপর দলটি নির্ভর করে। দলে একজনই নীতি-নির্ধারক, একজনই রাজনৈতিক পরিকল্পনাকার, একজনই প্রেরণার উৎস, একজনই মুখপাত্র— বাকিরা সবাই ফরমাস খাটেন মাত্র।

এই আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক আলোচনা পরের কোনও সংখ্যায় হবে।

সময়	স্থান	ঘটনা
মার্চ ১৯৭০	বর্ধমান শহর	সাঁইবাড়িতে মলয় ও প্রণব সাঁই ওবং পরে গুণমণি রায়কে বীভৎসভাবে খুন। নেতৃত্বে— বিনয় কোঙার, নিরুপম সেন, মানিক রায় ওরফে অনিল বসু প্রভৃতি।
আগস্ট ১৯৭৮-জানুয়ারি ১৯৭৯	মরিচঝাঁপি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা	গণহত্যা, অন্তত ৬০০ মানুষের মৃত্যু, বেশিরভাগ নারী ও শিশু।
সম্ভবত ১৯৮০	কলকাতা, তিলজলা থানার ভিতরে	পুলিশের ওসি গঙ্গাধর ভট্টাচার্যকে হত্যা। নেতৃত্বে— কান্তি গাঙ্গুলি।
এপ্রিল ১৯৮২	কলকাতা, বালিগঞ্জ ওভারব্রিজ	১৭ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা, নেতৃত্বে শচীন সেন ও কান্তি গাঙ্গুলী।
মার্চ ১৯৮৪	কলকাতা, মেটিয়াবুরুজ	ডি সি পোর্ট বিনোদ মেহতা ও তার দেহরক্ষী মোক্তার আলি খুন। তারপর পুলিশ হেফাজতে প্রধান সাক্ষী ইদ্রিস আলী খুন। ষড়যন্ত্রে—ফঃ বঃ নেতা কলিমুদ্দিন শামস।
জুন ১৯৯১	কান্দুয়া, থানা আমতা, হাওড়া	৪ জন কংগ্রেস সমর্থকের কব্জি থেকে হাত কেটে ফেলা। অপরাধ—তারা 'হাত'-এ ছাপ দিয়েছিল।
জুলাই ২০০০	সুচপুর, নানুর, বীরভূম	১১ জন ক্ষেতমজুরকে হত্যা।
জানুয়ারি ২০০১	ছোট আঙারিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর	১১ জন তৃণমূল সমর্থককে হত্যা; ষড়যন্ত্রে—সিপিএম মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ।
এপ্রিল ২০০১	জগন্নাথপুর, জাঙ্গিপাড়া, হুগলী	সিংহরায় পরিবারের ২ জন বিজেপি সমর্থককে হত্যা।

সরসঙ্ঘচালক ভাগবতের উত্তরবঙ্গ সফর

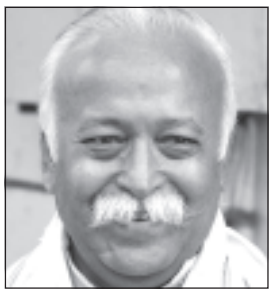

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগামী ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১১৫ তম জন্মজয়ন্তীতে শিলিগুড়ি আসছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকার জানিয়েছেন, অখিল ভারতীয় যোজনা অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে মিলিত হতেই এবার আসছেন মোহনজী। তিনি নেতাজীর জন্মদিন উপলক্ষে সেবক রোডস্থিত সারদা শিশুতীর্থে স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন। দুপুর আড়াইটের সময় সঙ্ঘের নিজস্ব পোষাকে (গণবেশে) স্বয়ংসেবকরা উপস্থিত থাকবেন বলে সঙ্ঘ সূত্রে জানানো হয়েছে। বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত থাকবেন ঘোষ-বাদকরাও।

মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী

(১ পাতার পর)

একটা লাগাম থাকার কারণে সঙ্কট ততটা ভয়াবহ হয়নি। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক দুরবস্থার দরুণ আমেরিকা তাদের দেশে আউটসোর্সিং বন্ধ করে দেবার কারণে বহু ভারতীয় চাকরি হারায়। মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাগুলো সেই সময়ও ভারতে বাণিজ্য করে গেছে চুটিয়ে। স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা যখন ভারতের বাজারকে ধরতে চাইছেন, তখনও কেন্দ্র সরকার দেশীয় শিল্পকে বাঁচানোর কোনওরকম প্রচেষ্টাই করছেন না। ফলে মূল্যবৃদ্ধি হলে মধ্যবিত্ত ও গরীবের জীবন-সংশয় অনিবার্য এবং সহজবোধ্য কারণে তা কেন্দ্রীয় সরকারের জন্যেই। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এই মূল্যবৃদ্ধির পেছনে সরকারের মদতপুষ্ট সীমাহীন দুর্নীতিকেই দায়ী করছেন।

পরিবর্তন আনবে?

(১ পাতার পর)

বর্গাদারদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার কথাই ভাঙ্গা রেকর্ডের মতো প্রতিটি নির্বাচনের আগে বাজায়। ভুলেও বলে না যে তিন দশক আগের সেই দরিদ্র বর্গাদাররা অনেকেই এখন পার্টি করার সুবাদে বড় জোতদার বনেছে। পার্টির অনুজ পাণ্ডেরা সর্বত্র জমির মালিকদের তাড়িয়ে নিজেরাই মালিক হয়েছে। জবরদখল জমিতে প্রাসাদ বানিয়েছে। বামফ্রন্টের ৩৫ বছরের শাসনে সমস্ত বামদলেরই ছোটবড় নেতা কর্মীদেরই প্রভূত উন্নতি হয়েছে। রাজ্যবাসীর উন্নতি হয়নি। উন্নয়ন খাতের বরাদ্দ প্রতি বছর পার্টির নেতা কর্মীদের ঘরে গেছে। আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে। এই প্রতারক বামফ্রন্ট সরকারের সত্যিই আর নেই দরকার। এদের এবার বঙ্গ বাসী কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করুন।

বামফ্রন্টকে হঠিয়ে শাসন ক্ষমতায় আসার প্রধান দাবিদার এবার তৃণমূল—কংগ্রেস জোট। এই জোট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা বাম অপশাসন দূর করে জনকল্যাণমূলক প্রশাসন পশ্চিমবঙ্গবাসীকে উপহার দেবে। ভাল কথা। কিন্তু কীভাবে? বিধানসভার নির্বাচনের আগেই যেভাবে দুই জোট শরিক নিত্য কাজিয়া করছে তাতে বিশ্বাস করা শক্ত যে ক্ষমতায় বসলে তারা ভাই ভাই এক ঠাঁই হয়ে যাবে। প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা নেত্রীরা সকলেই তৃণমূলকে তাদের যতটা রাজনৈতিক শত্রু বলে মনে করেন ততটা সিপিএমকে নয়। প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব একমত যে তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় এলে কংগ্রেসের পৃথক দলীয় অস্তিত্বই মুছে যাবে। সিপিএম যেভাবে বামজোটের শরিকদের সাইনবোর্ডসর্বস্ব পার্টি করে দিয়েছে সেই চেনা পথেই হাঁটবেন প্রধান বিরোধী জোটের প্রধান নেত্রী। ডাঃ মানস ভুঁইয়া, দীপা দাসমুন্সীরা তাই বিমান-বুদ্ধদেরই ক্ষমতায় দেখতে চাইবেন দলের সার্বিক স্বার্থে। বেশ কিছুটা আত্মস্বার্থেও। কোনও সন্দেহ নেই তৃণমূল ও কংগ্রেসের তথাকথিত বিরোধী জোট আদতে নেউল ও সাপের বন্দুত্বপূর্ণ সহাবস্থান।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারপাশে যে স্তাবকদের মুখ দেখা যায় তাদের দেখে বিশ্বাস হয় না মন্ত্রী হলে জনকল্যাণ করার সামান্যতম যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা তাদের আছে। কলকাতা কর্পোরেশনের পরিচালক এখন তৃণমূল দল। পুর নির্বাচনের আগে দলের পক্ষ থেকে উন্নয়নের বিস্তর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। আশা করি, কলকাতার নাগরিকরা তা ভুলে যাননি। গত প্রায় এক বছর ক্ষমতায় থাকার পরেও কলকাতা করপোরেশন সেই চোরপরেশন আছে। প্রসাশনিক কাজকর্মের সামান্যতম পরিবর্তন হয়নি। তৃণমূল নেত্রী স্বয়ং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁর দলের নিয়ন্ত্রিত পুরসভা এবং কলকাতা কর্পোরেশনের জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের পূর্ণ খতিয়ান প্রতি ছয় মাস অন্তর প্রকাশ করা হবে। প্রতিশ্রুতি পালিত হয়নি। নেত্রী আবার কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী। লোকাল ট্রেনের নিত্যযাত্রীরা এতদিনে বুঝে গেছেন যে লালুর জমানা থেকে এখন মমতার রাজত্বে রেলযাত্রীরা যে নরকে ছিলেন সেখানেই আছেন। পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। দূরপাল্লার ট্রেনে যাত্রী পরিষেবা বলতে কিছুই নেই ভুক্তভোগী ট্রেন যাত্রীরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। এদিকে অক্লান্ত রেলমন্ত্রী প্রতি সপ্তাহে রাজ্যের কোথাও না কোথাও সবুজ ফ্ল্যাগ নেড়ে চলেছেন। আর বিভ্রাট হলেই বলছেন সিপিএম ক্যাডাররা তাঁকে অপদস্থ করতেই ট্রেনে নাশকতা করছে।

প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। রেলমন্ত্রী হিসাবে নিত্যনতুন প্রকল্প ঘোষণা করে মমতা এখন কল্পতরু। তারপর প্রকল্পের কাজ না হলে বলছেন সিপিএম কাজ করতে দিচ্ছে না। মমতার অভিযোগ সত্য বলে বিশ্বাস করলে এ' কথাও মানতে হবে যে অদূরভবিষ্যতে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলে এমন কথাই বলবেন। কারণ, টানা ৩৫ বছর ক্ষমতায় থাকার সুবাদে সিপিএম রাজ্য প্রশাসনের সর্বস্তরে দলীয় কর্মী সমর্থকদের বসিয়েছে। মমতার সবুজ ব্রিগেডকে রুখে দিতে তারা লাল ব্রিগেড নামাবে। এই রাজনীতির লড়াইতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এখন যেমন অন্ধকারে বাস করছেন তখনও সেই তিমিরেই বাস করবেন। তাই সময় এসেছে স্পষ্ট ভাষায় বলার যে আমরা আপনার অনুযোগ অভিযোগ শুনতে চাই না। আমরা কাজ দেখতে চাই। আমরা অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরতে চাই। যদি সেই আলোর কাণ্ডারী হতে পারেন তবে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ আপনাকে আপনার দলকে ক্ষমতার সিংহাসনে সাদরে বসাবে। কিন্তু তারপর বলা চলবে না যে সিপিএম আমাদের কাজ করতে দিচ্ছে না। এ'সব ছেঁদো কথায় রাজ্যবাসী ভুলবে না।

এই সময়

সংস্কৃত বইমেলা

সংস্কৃত ভারতীর উদ্যোগে ৭ থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত চার দিনব্যাপী অভিনব বিশ্ব সংস্কৃত বইমেলা আয়োজিত হচ্ছে খোদ ব্যাঙ্গালোর শহরের বুকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকী বিদেশ থেকেও থেকে সংস্কৃতপ্রেমী ব্যক্তি ছাড়াও সংস্কৃত ভাষার শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষানুরাগী মিলিয়ে ৬০০০-এরও বেশি মানুষ এতো যোগদান করেন। প্রাচীন গৌরবময় এই ভাষা সংক্রান্ত প্রদর্শনী ও সাহিত্য-বিক্রয়ের পাশাপাশি সাধারণ সংস্কৃত জ্ঞানের পরীক্ষা, 'সালাকা-পরীখা'-রও আয়োজন করেছিলেন উদ্যোক্তারা। বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যের পুস্তক, ডিভিডি, সিডি বিক্রয়ের হারও উল্লেখযোগ্য বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। বিশেষ করে ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত সাহিত্যের বিক্রি খুশি করেছে সংস্কার ভারতীর কর্তৃপক্ষকে। সঙ্গীত, নৃত্য এবং নাটকের বৈকালিক অনুষ্ঠান ছিল সংস্কৃত বইমেলার অন্যতম আকর্ষণ।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারত

দীর্ঘ উনিশ বছর বাদে ফের রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ নতুন করে লাভ করলো ভারত। ১৫ সদস্যের এই কাউন্সিলে আগামী দু'বছরের টার্মে ভারতের পাশাপাশি এসেছে জার্মানী, দক্ষিণ আফ্রিকা, কলম্বিয়া এবং পর্তুগাল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিধি মেনেই আগামী আগস্টে এবং ২০১২-এর নভেম্বরে নিরাপত্তা পরিষদে সভাপতিত্ব করবে ভারত। কূটনীতিকরা মনে করছেন জি-৪ ভুক্ত দেশগুলি (জার্মানী, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত) সন্ত্রাসবাদ রোধ করতে নিরাপত্তা পরিষদে কড়া অবস্থানই নেবে। যাতে চীন ও পাকিস্তানের মতো দেশগুলো বিপন্ন হতে পারে। তবে কূটনীতিকরা এও বলছেন যে আমেরিকার কর্মকাণ্ডের ওপর ভারতের নজরদারির আশু প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্কেই।

গো-উদ্ধার

বি এস এফের তৎপরতায় বাংলাদেশ লাগায়ো চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্তে আটকে গেল গোরু পাচার। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৪৮টি গোরু। যার আর্থিক মূল্য অন্তত তিন লক্ষ টাকা। গত ৩ জানুয়ারি ভোরে ঘন কুয়াশার মধ্যে বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা করে। বি এস এফ-এর কোম্পানী কম্যান্ডার সুখবীর সিং-এর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে চোরাকারীদের বাংলাদেশের দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করলেও তাদের ধরতে পারেনি। মেখলিগঞ্জসহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বাংলাদেশ সীমা সংলগ্ন অঞ্চলে গো-পাচারের অভিযোগ ইদানীং অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরাই এর পেছনে রয়েছে বলে বি এস এফ সূত্রে খবর। সেই কারণে সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি করার কথাও বলা হয়েছে।

মুশকিল আসান ভিএইচপি

১৯৯৯ সালে জয়সলমীরের একটি মন্দিরে বিবাহ হয়েছিল বিশ্বজিৎ বর্মন ও লতিফা খাতুনের। লতিফার বাড়ি রাজস্থানের নিশিগঞ্জ সংলগ্ন উনিশবিশা গ্রামে। বিশ্বজিতের বাড়ি এই বাংলাতেই, কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের সিঙ্গিজানি গ্রামে। বিশ্বজিতের বাড়ির লোকেরা কোনওভাবেই তাদের ছেলের এক মুসলমান রমণীর পানিগ্রহণের ঘটনাকে মানতে পারেননি। সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁরা দ্বারস্থ হন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের। অবশেষে ভি এইচ পি কার্যকর্তাদের মধ্যস্থতায় লতিফা হিন্দুধর্মে দীক্ষা নেন। স্থানীয় পুরোহিত দিয়ে যজ্ঞ করানো হয়। নতুন বছরের শুরুতেই নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তারা। প্রসঙ্গত, লতিফা আগেই নিজের নাম পরিবর্তন করে অনিতা মণ্ডল নামে পরিচিত হন। তাঁদের সন্তানও রয়েছে। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সামাজিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে ভি এইচ পি-র কোচবিহার জেলা সভাপতি প্রিয়নাথ চক্রবর্তী জানিয়েছেন।

মাওবাদীরা জনজাতিদের শত্রু

এম ভি কামাথ

"Government's proposal for a sit-down talk is the most absurd, which only stupid minds can think of"—সরকারের আহ্বানে আলোচনার টেবিলে বসা অসম্ভব এবং স্টুপিড ভাবনা-চিন্তা মাত্র। একথা সিপিআই (মাওবাদী) দলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র প্রয়াত চেরুকুরি রাজকুমার ওরফে আজাদের।

রাজকুমার যখন নাগপুরে ধরা পড়েন তখন তার জানা ছিল না যে, আর কয়েকদিনের মধ্যে আদিলাবাদের জঙ্গলে এনকাউন্টারে তার মৃত্যু হবে। সম্ভবত, সরকারের সঙ্গে আলোচনা এবং যুদ্ধ বিরতির পূর্বশর্ত বিষয়ে আলোচনার শর্তাবলী নিয়ে দলের পলিটব্যুরোর শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য আজাদ দণ্ডাকারণ্যে যাচ্ছিলেন। তবে সেই আলোচনা আর কোনওদিনই বাস্তবে রূপান্তরিত হয়নি। তবে তার নিজের মতামত মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল 'মাওইস্ট ইনফরমেশন বুলেটিন'-এর ১৯ অক্টোবর, ২০০৯ সংখ্যায় এবং বামপন্থী পত্রিকা 'Mainstream'-এর ১০ জুলাই ২০১০ এবং সাধারণতন্ত্র দিবস-এর বিশেষ সংখ্যায়। মাওবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন জেলায় শান্তি স্থাপনে আজাদের বিরূপ এবং ক্ষুব্ধ মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। তার বক্তব্য ছিল— 'যদি মনমোহন এবং চিদাম্বরম্ ভেবে থাকেন যে, আলোচনার টেবিলে বসার ডাক দিয়ে প্রকৃত ইস্যুকে বাদ দিয়ে মাওবাদীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছেন, তাহলে তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।'

আজাদ আলোচনার পূর্বশর্ত হিসেবে যে সকল কথা বলেছিলেন তা মাওবাদীদের পুরানো ও অপ্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এইসব শর্তের মধ্যে ছিল (১) মাওবাদীদের এবং তাদের সমর্থকদের অন্যায়ভাবে আটক করা বন্ধ করতে হবে।

(২) নিরস্ত্র মানুষজনকে হত্যা ও অত্যাচার বন্ধ করতে হবে।

(৩) এখনই জনসাধারণের সম্পত্তি ধ্বংস ও আদিবাসীদের গ্রাম জ্বালানো বন্ধ করতে হবে।

(৪) 'সালয়া জুডুম', শান্তি সেনা, কোবরা বাহিনী প্রভৃতি তুলে দিতে হবে।

(৫) জনসাধারণের উপর অত্যাচারের তদন্তের জন্য নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে।

(৬) মাওবাদী সন্দেহে ধৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।

(৭) ইউ এ পি এ-র মতো মধ্যযুগীয় আইন তুলে দিতে হবে।

(৮) আদিবাসীদের রক্ষার নামে যে সকল পুনর্বাসন শিবির কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মতো খোলা হয়েছে তা বন্ধ করতে হবে।

(৯) যে সকল পরিবারের উপর পুলিশী বর্বরতা চলেছে তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আজাদ হয়তো ওয়াকিবহাল ছিলেন না যে— যেসব অভিযোগ তিনি শর্তাকারে সরকারের বিরুদ্ধে করছেন সে সবই একইভাবে তার দলের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। সি পি আই (মাওয়িস্ট) দলও ব্যাপকহারে মানুষদের হত্যা করেছে যেহেতু তারা তাদেরকে (নিহতদের) তাদের আদর্শের (মাওবাদ) বিরোধী বা শত্রু বলে মনে করে। অথচ বর্তমানে 'মাওবাদ' এক কালবাহ্য অপ্রাসঙ্গিক আদর্শ হিসেবে পরিগণিত।

তাদের কিছু কথাবার্তা যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে, এতদ্‌সত্ত্বেও সেসব স্বীকার করে নিলে তা দেশের আর্থিক প্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক বলে প্রতিভাত হবে। যেমন— উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আজাদের দাবীমতো আদিবাসীদের অধিগৃহীত জমি যদি ফেরৎ দিতে হয়, তাহলে শালবনী (পশ্চিমবঙ্গ), কাথিকুণ্ড (ঝাড়খণ্ড), লোহাণ্ডিগুডা, পাল্লামাদ, দোধঘাট (সবই ছত্তিশগড়ে) এবং নিয়ামগিরি (উৎকল) প্রভৃতি উন্নয়ন প্রকল্প বন্ধ করে জমি আদিবাসীদের ফেরৎ দিতে হয়। আজাদ চেয়েছিলেন, তাবৎ 'মৌ' ছত্তখত্তগ্ন যা ভারত সরকার ও টাটা-মিত্তল, জিন্দাল সহ বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানীর মধ্যে পারস্পরিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছে তা বাতিল করে দিতে। এই তালিকা বেশ লম্বা।

আজাদ এবিষয়ে নিশ্চিৎ যে, তাদের দলের সুশিক্ষিত গেরিলাবাহিনী প্রবলতম শত্রুর মোকাবিলা করতে সক্ষম এবং প্রয়োজনে যুদ্ধনীতি পরিবর্তন করে সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশ ধারণ করবে। তাকে (আজাদকে) যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল— অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করে (সরকারের পূর্বশর্ত) সরকারের সঙ্গে তারা আলোচনায় বসতে রাজী কিনা! তখন আজাদের উত্তর ছিল— "কক্ষনো না। একথা তারা স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারে না। তাহলে তা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার সামিল হবে। আজাদ সকল ভারতবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন যে, গেরিলা যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত উন্নত স্বরূপই হলো 'হিট অ্যান্ড রান' (আঘাত করেই দ্রুত পলায়ন)। যেখানেই শত্রুশক্তি কম সেখানেই আঘাত হানা। দিবারাত্র শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করা, সাপ্লাই লাইন কেটে দেওয়া, পরিস্থিতি অস্থির করে তোলা, আঘাতে আঘাতে শত্রুকে নির্মূল করে দেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত এলাকা থেকে উৎখাত করা।

মৃত আজাদ সম্পর্কে একটা কথা বলা যায়— সে কিন্তু তার নিষ্ঠুর পদ্ধতি বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে কৃতসংকল্প ছিল। আজাদ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, ভারতীয় মাওবাদীরা পাগলদের মতোই অবাধ্য ও জনবিরোধী, ঠিক মাও নিজে যেরকম ছিলেন। মাও চীনা কৃষকদের স্পষ্টতই এক হত্যাকারী যে তার নিজের দেশবাসীদেরকে গণহারে হত্যা করেছে। মাও-এর প্রামাণ্য জীবনী একথাই বলে। মাও ও তার অনুগামীদের বক্তব্য বিষয় খুবই সরল— হত্যা, হত্যা, হত্যা। "সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর প্রতিশোধ নাও।" তাদের ভাষা হলো আদিম (antediluvion)। তারা অবশ্যই গর্বাচেভ বা দেং-এর (দেং জিয়াও পিং) নামই শোনেনি। তারা এখনও বিশ বা তিরিশের দশকের (১৯২০-১৯৩০) ধ্যান-ধারণার মধ্যেই আবদ্ধ রয়েছে। তারা সোনিয়া-মনমোহন-চিদাম্বরম্ ত্রয়ীকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ বলেই অভিহিত করে। মাওবাদ হত্যা ও লুঠপাটকে জনজাতিদের স্বার্থরক্ষার নামে সমর্থন ও উৎসাহিত করে। এক্ষেত্রে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ। তারা (মাওবাদীরা) কখনও বিশ্বাস করে না যে হিংসা-উন্মত্ততা-দুঃসাহসিক নিন্দাযোগ্য কাজকর্ম, ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং অবিরাম কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ি ব্যতিরেকে আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ হওয়া সম্ভব।

বর্তমান ভারতবর্ষ বিশের দশকের (১৯২০) রাশিয়া বা তিরিশের দশকের (১৯৩০) চীন নয়। আজাদের বক্তব্য ছিল— "মানুষই ইতিহাস রচনা করে, কোনও একজন জর্জ বুশ, মনমোহন বা চিদাম্বরম্ নয়। ডঃ মনমোহন সিং এক শকুন, লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের সবকিছু লুঠ করে চলেছে।" এরকমই বিকৃত অসুস্থ মাওবাদী মনোভাব যা ভয়ঙ্কর। আজাদের বিশ্বাস ছিল দেশজুড়ে জনসুনামিতে মনমোহন-চিদাম্বরমরা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবেন।

এরকম মানসিকতার মাওবাদীদের সঙ্গে আলোচনা কিভাবে সম্ভব? তারা একটাই কথা মাত্র বোঝে— কাউন্টার ভায়োলেন্স।

(লেখক একজন বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক ও প্রসার ভারতীর প্রাক্তন ডিরেক্টর)

ভারতীয় মাওবাদীরা পাগলদের মতোই অবাধ্য ও জনবিরোধী, ঠিক মাও নিজে যেরকম ছিলেন। মাও চীনা কৃষকদের স্পষ্টতই এক হত্যাকারী যে তার নিজের দেশবাসীদেরকে গণহারে হত্যা করেছে। মাও-এর প্রামাণ্য জীবনী একথাই বলে। মাও ও তার অনুগামীদের বক্তব্য বিষয় খুবই সরল— হত্যা, হত্যা, হত্যা। "সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর প্রতিশোধ নাও।" তাদের ভাষা হলো আদিম (antediluvion)। তারা অবশ্যই গর্বাচেভ বা দেং-এর (দেং জিয়াও পিং) নামই শোনেনি। তারা এখনও বিশ বা তিরিশের দশকের (১৯২০-১৯৩০) ধ্যান-ধারণার মধ্যেই আবদ্ধ রয়েছে।

অ রকম

দশম বর্ষীয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নাম তার সুষমা। পদবী ভার্মা। বয়স মোটে দশ। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্জীকৃত (রেজিস্ট্রেশন) করা হয়েছে তার নাম, বিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে। আঁতকে উঠবেন না। ছাপার অক্ষরে ঠিক লাইনগুলিই পড়ছেন। মাত্র ১০ বছর বয়সেই লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতমা ছাত্রী'র মর্যাদা পেয়ে গিয়েছেন তিনি। কিন্তু ১০ বছরের মেয়ে কলেজ যাবে তাও কি সম্ভব? তার যোগ্যতাটাই বা কি? এহেন সন্দিগ্ধমনস্কদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাক এবছরই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সুষমা। পড়াশুনোয় যে তুখোড় তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক ও বায়োলজির জটিল বিষয়গুলো এক লহমায় সমাধান করে ফেলতে তার জুড়ি নেই। তাই এক ধাপে একাধিক ক্লাসের বাধা টপকে মাত্র ৭ বছর বয়েসেই দশম শ্রেণীর বোর্ডের পরীক্ষা দেবার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছিল সে। এর দু'বছর পরেই পাশ করে ইন্টারমিডিয়েট (দ্বাদশমান) পরীক্ষা। কিন্তু এত ছোট মেয়ে কী কলেজ-মানের পড়াশুনোর ভার নিতে পারবে? প্রথমে সন্দিগ্ধ ছিলেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও। কিন্তু পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপাত্র এস কে দ্বিবেদী জানান "আমাদের অর্ডিন্যান্সে বয়স নিয়ে কোনও বিধি-নিষেধ

সুষমা ভার্মা

সেভাবে নেই। স্নাতক কোর্সে ভর্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কখনও সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা ঠিক করে না। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়। সেই দিক দিয়ে তাই সুষমার ভর্তির ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই। পেশাদারী পাঠক্রমে ভর্তির ক্ষেত্রে আমরা কেবল বয়সের উর্দ্ধসীমা ধার্য করে থাকি। আর অন্য কোনও পাঠক্রমে এটা হয় না।" লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় তাই গত ২৮ ডিসেম্বরেই সাদরে বরণ করে নিয়েছে তাদের কনিষ্ঠতমা ছাত্রীটিকে। অবশ্য কমবয়সে উচ্চশিক্ষালাভের ব্যাপারে সুষমার পারিবারিক রাশিচক্র বেশ ভাল। সুষমার দাদা শৈলেন্দ্র ভার্মা মাত্র ১৫ বছর বয়সে কম্পিউটার গ্র্যাজুয়েট হয়ে ভারতের সবচেয়ে কম বয়সী কম্পিউটার গ্র্যাজুয়েট হিসেবে রেকর্ড করেন। অথচ শুনলে অবাক হতে হয় যে সুষমা শৈলেন্দ্রের বাবা তেজবাহাদুর ভার্মা দারিদ্র্যের কারণে বেশি-দূর লেখাপড়া শিখতে পারেননি। তবে পরবর্তীকালে চাকরি পান স্থানীয় এক স্কুলে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর চাকরী। পিওনের চাকরি।

তবে চাকরিটা আদতে স্কুলের হওয়ার সৌজন্যে লেখাপড়ার প্রতি একটা টান তেজবাহাদুরের ছিল বরাবরই। নিজের অপূর্ণ স্বপ্ন আজ ছেলে-মেয়ের মধ্যে দিয়েই পূরণ হচ্ছে তাঁর।

অসমে আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে উদ্বিগ্ন হিন্দুরা

বাসুদেব পাল ॥ ২০১১-তে যে কয়েকটি প্রদেশে বিধানসভার নির্বাচন হতে চলেছে তার মধ্যে অসমও রয়েছে। ২০১০-এর পুজোর পর থেকেই নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। ফলে শুরু হয়েছে নির্বাচনী জোট বা আঁতাতের ভাঙাগড়ার খেলা। চুলচেরা হিসাব ও বিশ্লেষণ চলছে কার বা কোন্ দলের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত গড়লে আখেরে লাভ হতে পারে।

এর ফলে ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-অগপ (অসম গণ পরিষদ) নির্বাচনী জোট ইতিমধ্যেই ভেঙে গেছে। সম্ভবত অসম রাজ্য কংগ্রেস এবং মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে গেল। কেননা অগপ-বিজেপি জোটই গত ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করেছিল। বিজেপি ও অগপ দলের নীতিগতভাবে একটা জায়গায় দারুণ মিল ছিল— উভয় দলই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নে সংকল্পবদ্ধ। লোকসভা নির্বাচনে মুসলমান ব্লক ভোট সম্ভবত অগপ'র ঝুলিতে আসেনি। ফলে নির্বাচনে অগপ'র তুলনায় বিজেপি'র সাফল্য বেশি হয়। অগপ মুখে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বললেও বাস্তবে কোনও কাজের কাজই করতে পারেনি। প্রথমে আসু (অল অসম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন) নেতা এবং পরে অসম গণ পরিষদ নেতা প্রফুল্ল মহন্ত দু' দফায় মুখ্যমন্ত্রিত্ব করেন। তিনি ছাত্রাবাস থেকে সোজা মুখ্যমন্ত্রী আবাসে এসে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন বিতর্কিত 'আই এম ডি টি' অ্যাক্টের এবং 'অসম চুক্তি,১৯৮৫' (কেন্দ্র, রাজ্য সরকার এবং আসু নেতৃত্বের মধ্যে স্বাক্ষরিত)-এর অন্যতম হোতা। ইতিপূর্বেই স্বস্তিকা'য় কয়েক দফায় প্রকাশিত হয়েছে—

তরুণ গগৈ

রঞ্জিত দত্ত

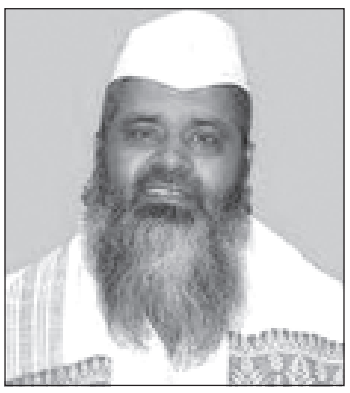

বদরুদ্দিন আজমল

প্রফুল্ল মহন্ত

'আই এম ডি টি'-আইনে কত স্বল্প-সংখ্যক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে বিতাড়ন করা সম্ভব হয়েছে। যে মূল উদ্দেশ্য নিয়ে 'অসম আন্দোলন' (বিদেশী বিতাড়ন) তা সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেয়েছে প্রফুল্ল মহন্ত মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন। কংগ্রেস যে মুসলিম ব্লক ভোটের কারণে বাংলাদেশী মুসলমান বিতাড়ন নিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ অবজ্ঞা করে বাংলাদেশীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখবে— একথা বলাই বাহুল্য। সেই একইরকমভাবে মুসলিম ব্লক ভোট পাওয়ার আশায় বিজেপি-অগপ জোট ঠিক বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ভেঙে ফেলা হয়েছে। এক্ষেত্রে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করার অপকর্মটি সুসম্পন্ন করতে যে দু'জন কুশীলব নেপথ্যে ছিলেন তাদের একজন হলেন খোদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত এবং অন্যজন প্রাক্তন বিধায়ক শহীদুল আলম (আলগাপুর, জেলা-হাইলাকান্দি)। এর ফলে মুসলিম ব্লক ভোট কতটা 'অগপ' দল পাবে তা নিশ্চিত বলা না গেলেও হিন্দু ভোট যে ভাগাভাগি হবে তা একরকম নিশ্চিত হয়ে যায়।

সম্প্রতি অসমের তরুণ গগৈ সরকার রাজ্যের নাগরিক পঞ্জীয়ন সূচী (National Register of Citizens õ± NRC) আপটু ডেট (হাল-নাগাদ) করার কর্মসূচী নিয়েছিল। মুসলমানদের (বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী)স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে তরুণ গগৈ-এর আমলে সেই কাজ এক পাও এগোয়নি। উল্টে পাঁচ কোটি টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে বলে খবর। এই কর্মসূচীর একটি আবশ্যিক শর্ত ছিল— সংশ্লিষ্ট নাগরিক বা তার পূর্বপুরুষের নাম ১৯৫১ অথবা ১৯৭১ সালের নাগরিক সূচীতে থাকতে হবে। সরকার ওই আবশ্যিক ধারা তুলে দেয় বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের বিশেষত, অল অসম মাইনরিটি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন-এর চাপে। অপরদিকে ভারতীয় জনতা পার্টিও তেড়ে ফুঁড়ে রাস্তায় নামে এনিয়ে। অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের দাবীতে গত ১৮ ডিসেম্বরে রাজ্যজুড়ে বিজেপি কর্মী-সদস্যরা 'জেল ভরো' কর্মসূচী নেয়। দারুণভাবে জনসমর্থন লাভ করে বিজেপি। জেলায় জেলায় ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। এধরনের কর্মসূচীর ফলে বিজেপি'র হিন্দু-ভোট ব্যাঙ্ক বাড়বে বই কমবে না। তাছাড়া বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা যে এদেশের গরীব মুসলিম শ্রমজীবীদের রুজি-রোজগারে থাবা বসাচ্ছে এটাও প্রচারের প্রয়োজন। সাধারণ মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্যও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন একান্ত জরুরী।

অন্যদিকে ২০০১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুসলমান স্বার্থরক্ষার জন্য (পড়ুন বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের) গঠিত হয়েছিল 'ইউনাইটেড মাইনরিটি ফ্রন্ট'। ২০০৬-এর নির্বাচনে যার নতুন নামকরণ হয় 'অসম ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট'। বেশ কিছু হিন্দুও স্থানে স্থানে ওই দলে যোগ দেন, নির্বাচনে প্রার্থীও হন। এখন ওই দলের নাম সামান্য রদবদল হয়ে দাঁড়িয়েছে 'অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট' বা এ আই ইউ ডি এফ। গূঢ় উদ্দেশ্য— অসমের প্রয়োগ ও সাফল্য অন্যান্য রাজ্যেও পরীক্ষা করে প্রতিষ্ঠিত করা। অসমে এই দলের কাণ্ডারী হলেন ধনকুবের বদরুদ্দিন আজমল।

এবার শাসক দল কংগ্রেস-এর কথা। অসমে লাগামছাড়া আর্থিক দুর্নীতি ক্যাগ (ট্রেট্টগু)-এর রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে। তরুণ গগৈ তা সামাল দিতে ব্যস্ত। বিরোধীরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত এককাট্টা। হাজার হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি। এন আই এ-র তদন্তেও একই কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও চলছে ব্যাপক মুসলিম তোষণ। ৬১ জন দাগী ও মারাত্মক সাজাপ্রাপ্ত আসামীকে প্যারোলে ছাড়া হয়েছিল। তারা আর ফেরেনি। জেল সুপার ছবিসহ পাতা ভর্তি বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের ধরিয়ে দেওয়ার আবেদন করে নিজে বাঁচতে চেয়েছে। প্রফুল্ল মহন্তর দাবী নির্বাচনে জেতার জন্যই এদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অগপ-বিজেপি তাই এখন রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করার দাবী তুলেছে। গতবার বোড়ো পীপুলস্ ফ্রন্টের ১২ জন বিধায়কের সমর্থনে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গড়েছিল। এবার নির্বাচনের প্রাক্কালে বি পি এফ-এর সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। উভয়েই উভয়ের এলাকায় আসন দাবী করায় পিরিত চটকে গেছে। দুই দলই একে অপরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবে। তবে ওয়াকিবহাল মহলের খবর— বি পি এফ-এর আসন সংখ্যা কোনওমতেই ৬/৭-এর বেশী হবে না। এটা অনুমান করেই কংগ্রেস এ আই ইউ এফ-এর সঙ্গে আঁতাত করতে মুখিয়ে রয়েছে। কিন্তু বদরুদ্দিন আজমল ধরা-ছোঁয়া দিচ্ছেন না। কেননা, উনি নিজেই মুখ্যমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছেন। অপরপক্ষে, প্রফুল্ল মহন্ত নিজে দল থেকে বিতাড়িত হয়ে তৃণমূল গণ পরিষদ করেছিলেন। তবে হালে পানি পাননি। এখন তিনি পুরাতন দলে প্রত্যাবর্তন করে আবারও মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার খোয়াব দেখছেন। সেজন্য বদরুদ্দিনের হাত ধরতেও তিনি পিছপা নন।

এবারে ভারতীয় জনতা পার্টি (এখনও পর্যন্ত যা খবর) একাই লড়ছে। জোট হয়নি। উল্লেখ্য, ভারতীয় জনতা পার্টি নববুই-এর দশকেই একা লড়ে দশটি বিধানসভায় জয়লাভ করেছিল। কিন্তু বিগত বিধানসভা নির্বাচনে অগপ-র সঙ্গে জোট করে বিশেষ লাভ হয়নি। হিন্দু ভোটকে সংগঠিত করে দলের দিকে টানতে পারলে বিজেপি-র এবারও লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক বিশ্বরূপ ভট্টাচার্যের মতে, ''অগপ জোট ভেঙেছে মুসলিম ভোটের প্রত্যাশায়। কিন্তু তাদেরও মনে রাখা উচিৎ হিন্দু ভোটাররাও অগপ থেকে মুখ ফেরাতে পারে। এবং তা বিজেপি-র বাক্সে পড়ারই সম্ভাবনা একশো ভাগ।''

নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত জোটের চিত্রটা পরিষ্কার হবে না। তবে এটুকু বলাই যায় যে কংগ্রেসের পক্ষে একক গরিষ্ঠতা পাওয়া সম্ভব নয়। জনসংখ্যার ভারসাম্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে জেলায় জেলায়। গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারপতিও বলেছেন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা এবারে নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে। হিন্দুরা তাই স্বাভাবিকভাবেই শঙ্কিত।

দেশজুড়ে রাজ্যে রাজ্যে অসন্তোষ পুলিশ মহলেই

নাগরিকদের নিরাপত্তা না দিয়ে নেতাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ একদিকে দেশের মানুষ যখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন, অন্যদিকে চুনোপুঁটি থেকে শুরু করে রাঘব-বোয়াল পর্যন্ত দেশের সমস্ত রাজনৈতিক নেতানেত্রী-ই চড়ছেন বুলেট প্রুফ গাড়ি, সঙ্গে থাকছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী। শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাই নয়, রাজনৈতিক প্রসাদভোগী বহু ভি আই পি এবং ব্যবসায়ীরাও নাম লিখিয়েছেন এই খাতায়। এনিয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে আডবাণী-সোনিয়া থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা লস্কর সহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনগুলোর 'টার্গেট লিস্ট'-এর একেবারে প্রথম দিকেই রয়েছেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে 'রাম-শ্যাম-যদু' মার্কা সব রাজনৈতিক নেতার ওপরেই জঙ্গি থ্রেট রয়েছে। কিন্তু তারাও সরকারী ক্ষমতার অপচয় করে যথেচ্ছভাবে লালবাতি লাগানো গাড়ি কিংবা ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

আর এ নিয়েই গোটা দেশের পুলিশমহলে একটা অসন্তোষের আবহ তৈরি হয়েছে। দেশের মোট নিরাপত্তারক্ষীদের একটা বড় অংশই রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ি কিংবা স্বয়ং রাজনৈতিক নেতাদেরই পাহারা দেবার কাজে পি এস ও (অর্থাৎ পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আধিকারিক) হিসেবে নিয়োজিত। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বহু তথাকথিত ভি আই পি এবং ব্যবসায়ীদেরও নিরাপত্তা দেন এঁরা। আর এই কাজ করতে গিয়েই অভিযোগ উঠছে দেশের অধিকাংশ থানাতেই পুলিশ-কর্মীর সংখ্যা এতই কমে যাচ্ছে, যার ফলে দেশের জনসাধারণকে ন্যূনতম সুরক্ষাটুকু দেওয়াও বেশ মুশকিল হয়ে পড়ছে। এমনকী 'রুটিন ওয়ার্ক' ও 'তদন্তের কাজ'-এর ক্ষেত্রেও এর ভালোমতো প্রভাব পড়ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ-কর্মীর বক্তব্য— "অনেক তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা, ভি আই পি এবং ব্যবসায়ীরা তাঁদের ওপর কোনও 'জঙ্গি হুমকি' ছাড়াই চুটিয়ে উপভোগ করছেন সরকারী খরচে নিরাপত্তা-ব্যবস্থা। এঁরা 'স্ট্যাটাস সিম্বল' হিসেবেই 'ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আধিকারিক'দের দেখছেন।"

সাধারণত অধিকাংশ রাজ্যেই জেলাস্তরে পুলিশ সুপারের নেতৃত্বাধীন একটি 'নিরাপত্তা কমিটি' নির্ধারণ করে সরকার কাদের কাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আধিকারিক বা পি এস ও দেবে। সেই অনুযায়ী তাদের নাম পাঠানো হয় রাজ্যস্তরের 'নিরাপত্তা কমিটি'র কাছে। রাজ্যস্তরের 'নিরাপত্তা কমিটি'ই কাদের ওপর 'থ্রেট' আছে সেই ভিত্তিতে বা জঙ্গি নাশকতার 'টার্গেটে' কেউ থাকলে কেবলমাত্র তাদেরই পি এস ও দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী ইদানীংকালে প্রায়ই বলছেন তাদের রাজ্যে নাকি নিরাপত্তা-ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের কংগ্রেসী নেতাদের হাব-ভাবে তা মালুম হচ্ছে না। তরুণ গগৈ সরকারের মন্ত্রী থেকে শুরু করে সামান্য বিধায়ক অবধি ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী পান, এ নয় তবু মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সম্পাদক থেকে শুরু করে যুব কংগ্রেসের হেজি-পেজি নেতাদেরও কোন্ আক্কেলে গগৈ সরকার পি এস ও মঞ্জুর করেন? সেখানকার এহেন 'অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়া' 'নিরাপত্তা-পরিস্থিতি' বর্ণনা করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের মন্তব্য— "বহু অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস আধিকারিক, যাদের কোনও নিরাপত্তা সমস্যা নেই, তারাও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আধিকারিক পাচ্ছেন সরকারী খরচে। আর এটা পাচ্ছেন অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পর থেকেই। এখানে (অসমে) বহু প্রাক্তন বিধায়ক রয়েছেন যারা খুব বেশিদিন রাজনীতিতে থাকেননি তারাও এই সরকারী সুযোগ ভোগ করছেন বিনামূল্যে। চা-বাগানের ম্যানেজারেরাও এই একই সুবিধা ভোগ করছেন। মানুষ দেখছেন সরকার এই পি এস ও-র সুবিধা এমন কয়েকজন ব্যবসায়ীকে দিচ্ছেন, তাদের আদৌ এই সুবিধার দরকার নেই।" এই বক্তব্যগুলো যদিও অসমে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকের, কিন্তু বাকি রাজ্যগুলোর অবস্থাও এব্যাপারে তথৈবচ বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

প্রসঙ্গত, জেলাস্তরের নিরাপত্তা কমিটি প্রতি বছর সমীক্ষা করে দেখেন যে এইসব পি এস এ-র সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা যে পরবর্তী এক বছরে সেই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আধিকারিক ব্যবহারের সুবিধা পাবেন কিনা তা নিয়ে। নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে নিরাপত্তা কমিটির পি এস ও-র মেয়াদ বৃদ্ধি বা তা বাতিল করেন। অথচ দেশের অধিকাংশ প্রান্তেই বছরের পর বছর যেভাবে কয়েকজন লোক পি এস ও-র সুবিধা ভোগ করে আসছে তাতে এই নিয়মের প্রয়োগ নিয়ে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে তা অমূলক নয়। প্রত্যেকটা রাজ্য সরকারই এই পি এস ও-দের পেছনে বহুকোটি টাকা ব্যয় করে আসছে বছর বছর। আর এতে কয়েকজন নীচুতলার রাজনৈতিক কর্মী, কিছু ভি আই পি এবং কয়েকজন ব্যবসায়ী ছাড়া আর কেউই উপকৃত হচ্ছেন না। বরঞ্চ তেলা মাথায় তেল দিতে গিয়ে জনসাধারণের বৃহত্তর অংশই উপেক্ষিত হচ্ছেন ন্যূনতম নিরাপত্তার সুবিধাটুকুনা পেয়ে। সংশ্লিষ্টমহল এও মনে করছে, কিছু লোককে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আধিকারিকের সুবিধা দেওয়ায় আসলে হয়রান হচ্ছেন সাধারণ নাগরিকরাই।

পবননন্দন শ্রীহনুমান

রবীন সেনগুপ্ত

স্বামী বিবেকানন্দের কিছু গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নামে জনৈক অনুরাগী স্বামীজীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। স্বামীজীর রচনাবলীর অনেক সংকলনে যেগুলিকে "স্মৃতিচারণা"— এই শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। সেই স্মৃতিচারণার দ্বাদশতম অধ্যায়ে এক স্থানে স্বামীজী বলছেন—তোমরা এদেশে শ্রীরামচন্দ্র এবং মহাবীরের পূজা প্রবর্তন করতে পার না?

মহাবীর বলতে বজরংবলী শ্রীহনুমানজীর কথাই এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন, স্বামীজীর এই মন্তব্যটি যথেষ্ট প্রচলিত নয়। কিন্তু মন্তব্যটি অবশ্যই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীরামচন্দ্র এবং হনুমানজীর আরাধনা বাংলা মুলুকে যথেষ্ট কমই হয়। যার জন্য প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠতা, ধার্মিক হয়েও দয়া, প্রেমিক ভাবধারা, সাত্ত্বিকতা ইত্যাদির সাথে বীরত্ব, লড়াকু মানসিকতা এই গুণগুলি বাঙালী ধর্মচর্চাকারীদের মধ্যে একটু কমই রয়েছে।

যাকে যখন আদর্শ করে পূজা করা যায় তাঁর চরিত্র নিয়ে চর্চাও স্বাভাবিক নিয়মেই কিছুটা চলে আসে। হনুমানজীর পূজা কম হওয়ায় তাঁকে নিয়ে চর্চাটাও এ রাজ্যে স্বল্পই হয়। এটা বঙ্গীয় ধর্মীয় মানচিত্রে একটা উল্লেখ করার মতো ত্রুটি বৈকি!

বাল্মীকি রামায়ণে বীর হনুমানজীর একটা প্রণিধানযোগ্য উক্তি আছে রাবণের উদ্দেশ্যে সুন্দর কাণ্ডের ৫১ তম অধ্যায়ের ২৮ তম শ্লোকে। হনুমানজী বলছেন— একদিকে জাঁকজমক করে ধর্ম পালন করছি আর অন্যদিকে নানা কুকীর্তি চালিয়ে যাচ্ছি— এতে শেষমেশ অমঙ্গলই হয়।

সংস্কৃত ভাষায় উদ্ধৃতিটি এইরকম— 'নতু ধর্মোপ সংহারম্ ধর্মফল সংহিতঃ। তদেব ফলমন্বেতি ধর্মশ্চাধর্ম নাশনঃ। প্রাপ্তং ধর্মফলং তাবদ্ভবতা নাত্র সংশয়ঃ। ফলমস্যাপ্যধর্মস্য ক্ষিপ্রমেব প্রপৎস্যসে।

হনুমানজীর এই কথাগুলি বর্তমান যুগের বাঙালীদের কাছে খুবই শিক্ষণীয়। কারণ বাঙালীরা যেভাবে জাঁকজমক করে পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারি পূজাগুলি করে চলেছে অথচ ভিতরে ভিতরে স্বধর্মের বিরোধিতা, স্বধর্মকে অবজ্ঞা, ভিন্নধর্মকে তোষণ করার নীতি যেভাবে চালিয়ে যাচ্ছে তাতে ইতিমধ্যেই অনেক অমঙ্গল হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো অমঙ্গল হতে পারে।

ব্যতিক্রম অবশ্যই অনেকে আছেন। অনেকেই আজও এই বাংলা মুলুকে বাস করে যথেষ্ট ভক্তি ও বীর ভাব বজায় রেখে খুব একটা জাঁকজমক প্রদর্শন না করে ধর্ম পালন করেন। কিন্তু তাদের সংখ্যাটা অল্প। হনুমৎ শক্তি জাগরণ হলে সংখ্যাটা ধীরে হলেও বৃদ্ধি পাবে এইরকম একটা ইতিবাচক আশা আমরা করতেই পারি।

হনুমানজী অল্প বয়সে খুব দস্যিপনা করে বেড়াতেন। একবার এক ঋষিকে তিনি খুব চটিয়ে দিয়েছিলেন দুষ্টুমি করতে গিয়ে। ঋষিটি তখন হনুমানকে এই বলে অভিশাপ প্রদান করেন যে হনুমান তার স্বীয় মহাশক্তির কথা বিস্মৃত হবে। অভিশপ্ত হয়ে অনুতপ্ত হনুমান ক্ষমা প্রার্থনা করলে সাধুটি তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে— কেউ মনে করিয়ে দিলে হনুমান তাঁর শক্তির প্রয়োগে পুনরায় তৎপর হতে পারবেন।

সারা জীবনে হনুমানজীকে বেশ কয়েকবার বিপদের সময় শোকে মুহ্যমান হতে দেখা গেছে। তারপর কেউ তার ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তাঁকে পুনরায় কার্যকরী হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছে।

এটা শুধু হনুমানজীর ক্ষেত্রেই নয়। সমস্ত হিন্দু জাতিই মাঝে মধ্যে তার বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার, ঐতিহ্য, রণশক্তির কথা বিস্মৃত হয়ে পড়ে। তখন হিন্দুদের সেই আত্মবিস্মরণ দশা দূরীভূত করার জন্য ঈশ্বর কোনও বিরোধী শক্তিকে দিয়ে আমাদের আঘাত করেন। আঘাত পেয়ে আমরা আবার চর্চা শুরু করি স্বীয় ঐতিহ্যের। এমনি ভাবে আবার আমরা জাগ্রত হয়ে উঠি।

এই প্রক্রিয়া বহু যুগ ধরেই চলে আসছে। এখন আমাদের জাগরণের সময়। তাই পবনপুত্রের স্মরণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। শাস্ত্র থেকে আমরা পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যমভ্রাতা ভীমকেও পবনদেবের অংশজাত হিসাবে পাই। আবার রুদ্রাত্মশক্তি বীর হনুমানজীও পবননন্দন নামে পরিচিত। উভয় পবননন্দনই ধর্ম প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ভীম কিন্তু ততটা পূজনীয় নন। কারণ ভীমের প্রভুভক্তি শ্রীহনুমানজীর মতো এত প্রবল ছিল না। হনুমানজীর সঙ্গীত জ্ঞানের উল্লেখ লিঙ্গপুরাণের এক স্থানে রয়েছে। ভীমের সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শিতার খুব একটা উদাহরণ কোথাও নেই। হনুমানজীর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের কঠোরতাও ভীমকে কখনও অবলম্বন করতে হয়নি। রামের পরমভক্ত হয়েও শিবের প্রতি সমান ভক্তিই বা হনুমানজীর মতো আর কে প্রদর্শন করতে পেরেছেন? হিন্দুদের মধ্যে ছোট ধর্মগ্রন্থের ক্রয় বিক্রয় ও পাঠের একটা বিশেষ প্রবণতা আছে। এই সকল ক্ষুদ্র গ্রন্থের মধ্যে অবশ্যই গীতার বিক্রয় ও পঠন-পাঠন সর্বাধিক। কিন্তু গীতার পরই যে গ্রন্থগুলির ক্রয় বিক্রয় ও পঠন-পাঠন অধিক হয় তার মধ্যে অবশ্যই শ্রীহনুমান চালিশার নামটিকে সর্বাগ্রে রাখতে হবে। হনুমান চালিশার প্রথম দিকেই শ্রীহনুমানজী সম্পর্কে বলা হয়েছে— জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর। জয় কপীস তিনহুঁ লোক উজাগার।। রামদূত অতুলিত বল ধামা। অঞ্জলি পুত্র পবনসুত নামা।। মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী। কুমতি নিবার সুমতি কে সঙ্গী।।

মাত্র ছয়টি লাইনের মধ্যে এত বড় একটা চরিত্রকে এমন কাব্যসুষমামণ্ডিত ভাষায় প্রকাশ করাটা যথেষ্ট কৃতিত্বের। যারা রামচন্দ্রের অস্তিত্ব মানেন না বা মানলেও তাঁকে শ্রদ্ধা সম্মান করেন না তাদের কুমতি নিবারিত হয়ে সুমতি ফিরে আসুক শ্রীহনুমানজীর নিয়মিত স্মরণ ও মননের মাধ্যমে— এই প্রার্থনা জানিয়ে রচনাটি পরিসমাপ্ত করছি।

অতুলিতবলধামাং হেমশৈলাভদেহং
দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম।
সকলগুণনিধনং বানরানামধীশং
রঘুপতিপ্রয়ভক্তং বাতজাতং নমামি।।

প্রয়াগের বড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শহরটার বুকে পা রাখলেই বোঝা যায় শহরটার মাহাত্ম্য। যুগ পাল্টেছে, পাল্টেছে সময়ও। কিন্তু পাল্টায়নি শহরটির বুকে গেঁথে থাকা হিন্দু ধর্ম, বিশ্বাস ও সংস্কৃতি। আজও এলাহাবাদ 'তীর্থরাজ প্রয়াগ' নাম নিয়ে সারা বিশ্বের সামনে বিরাজমান। তবে প্রয়াগের কপালে 'তীর্থরাজ' আখ্যাটি প্রয়োগের পেছনেও রয়েছে একটি পৌরাণিক কাহিনী। পৌরাণিক মতে, এলাহাবাদ শহরটির সৃষ্টিকর্তা ভগবান ব্রহ্মা। 'তীর্থরাজ' নামটি ভগবান ব্রহ্মারই দেওয়া। বহু দূরদূরান্ত থেকে লোক প্রয়াগে আসেন নিজেদের জীবন সার্থক করতে। এমনকী প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থ বেদের পাতায় চোখ রাখলেও উল্লেখ পাওয়া যাবে প্রয়াগের।

উত্তরপ্রদেশের এই শহরটির কথা মনে এলেই চোখের সামনে ভেসে উঠে তিনটি জিনিষ— গঙ্গা, কুম্ভ মেলা ও শহরটির বুকে অবস্থিত কয়েকশো মন্দির। এরমধ্যে কোনও মন্দিরটি সাম্প্রতিক, কোনটা প্রাচীন আবার কোনটা বা অতি প্রাচীন।

মন্দিরের শহর প্রয়াগ। তাই যেখানে মন্দির আছে, দেবদেবীদের নিত্য আরাধনা আছে, সেখানে তাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে কিছু ঘটনা, কিছু বিশ্বাস। এমনই একটা মন্দিরের সন্ধান এখানে পাওয়া যায় যেটাকে বলা হয় "বড়ে হনুমানজীর মন্দির"। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল প্রয়াগে অবস্থিত 'বড়ে হনুমানজীর' এই প্রাচীন মন্দিরটি।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে খোঁজ করলে হয়তো সন্ধান পাওয়া যাবে অজস্র হনুমান মন্দিরের। কিন্তু প্রয়াগের বড়ে হনুমানজীর মন্দির শুধু ভারতবর্ষেই নয়, গোটা বিশ্বর মধ্যেও একটি বিস্ময়কর উদাহরণ। মন্দিরে পবনপুত্র বসে বা দাঁড়িয়ে নন, ভক্তদের সামনে ধরা দিয়েছেন পেছনদিকে হেলান দেওয়া অর্থাৎ শোওয়া অবস্থায়।

তবে হনুমানজীর এইরূপ আশ্চর্য মূর্তি জন্ম দিয়েছে একটি আশ্চর্য কাহিনীরও। কাহিনীটার সূত্রপাত জানতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ১৫ শতাব্দীতে। সেইসময় একজন বণিক পবনপুত্রের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, ভগবান যদি তার স্ত্রীর কোলে সন্তান দেন, তাহলে তিনি একটি হনুমান মন্দির নির্মাণ করে পবনপুত্রকে প্রতিষ্ঠা করবেন। ভগবানের আশীর্বাদে বণিকের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় বণিক বিন্ধ্যাচল অঞ্চলে পবনপুত্রের এক বড় মূর্তি নির্মাণ করার উদ্যোগ নেন। মূর্তি নির্মাণের পর মূর্তিটির অভিসিঞ্চন করার উদ্দেশ্যে তিনি মূর্তিটিকে নিয়ে পদক্ষিণ করেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন নদীতে।

মূর্তিটিকে নিয়ে তিনি যখন প্রয়াগে এলেন, তখন তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন যে তিনি যদি মূর্তিটিকে প্রয়াগের গঙ্গার ঘাটে রেখে দেন তাহলে তার সব আশা পূর্ণ হবে। বণিক মূর্তিটিকে গঙ্গার ঘাটে ফেলে রেখে নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন। পরবর্তীকালে বণিকের সব আশা পূর্ণ হয়েছিল। মূর্তিটি বছরের পর বছর গঙ্গার ঘাটে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রইল। সময়ের সাথে সাথে মূর্তিটি বালির তলায় চাপাও পড়ে গেল। কিন্তু একদিন একজন সাধু মূর্তিটিকে বালির তলা থেকে উদ্ধার করলেন। পরবর্তী সময়ে মুঘল সম্রাট সাধুটিকে মন্দির নির্মাণ করে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ৩ মাইল চতুর্ভূজাকার একটি জমি দান করেন। লোকমুখে প্রচারিত এই ঘটনাটির সত্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও গোটা দেশবাসীর চোখে মন্দিরটি যে শ্রদ্ধার উচ্চ আসনে অবস্থান করে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। পুরাণের মতে, ভগবান হনুমান হলেন অমরত্বের অধিকারী। তিনি ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে যেমন ছিলেন তেমনি কলিযুগেও

শ্রীহনুমান কথা

গোপাল চক্রবর্তী

শক্তি, সাহস, ভক্তি, বীরত্ব, ন্যায়নিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য, কর্তব্যপরায়ণতা, নির্ভরযোগ্যতা, সত্যবাদিতা, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি গুণের অপূর্ব সমন্বয়ে হনুমান চরিত্র ভারত তথা বিশ্ববাসীর সামনে এক বিরল দৃষ্টান্ত। সমগ্র রামায়ণে আমরা শ্রীহনুমানকে সঙ্কটমোচনরূপে পাই। শ্রীরামচন্দ্র যখনই কোনও না কোনও সঙ্কটে পড়েছেন হনুমান তাঁর অসামান্য সাহস বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তায় সেই সঙ্কট থেকে রাম লক্ষ্মণকে উদ্ধার করেছেন। বাল্মীকি, তুলসীদাস এবং কৃত্তিবাস নানাভাবে হনুমান চরিত্র বর্ণিত করেছেন। শিবপুরাণে শ্রীরামচন্দ্র বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার, লক্ষ্মণ শেষনাগের আংশিক অবতার এবং হনুমান স্বয়ং শিব অর্থাৎ রুদ্রাবতাররূপে প্রকটিত হয়েছেন। স্কন্দপুরাণেও শিবের হনুমানরূপে আবির্ভূত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। 'কূর্মপুরাণে'ও আমরা হনুমানকে শিবের অবতাররূপে দেখি। 'দেবী ভাগবতে' বিষ্ণু রামরূপে, শেষনাগ লক্ষ্মণরূপে, লক্ষ্মীদেবী সীতারূপে এবং অন্যান্য দেবতারা হনুমানসহ বানররূপে অবতীর্ণ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'ও শিবের হনুমানরূপে আবির্ভূত হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়। অদ্ভুত রামায়ণে হনুমান ও শিবকে অভিন্নরূপে দেখানো হয়েছে।

রামায়ণে হনুমানের যে জন্মবৃত্তান্ত আমরা পাই তাহলো পরম রূপবতী অপ্সরা পুঞ্জকস্থলী শাপভ্রষ্ট হয়ে কপিবংশে কপীন্দ্র কুঞ্জরের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হলো অঞ্জনা। সুমেরু পর্বতের বানরাধিপতি কেশরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অঞ্জনা একদিন পুষ্পসজ্জায় সুসজ্জিতা হয়ে পর্বতে ভ্রমণ করছিলেন, তখন পবনদেব তাকে দেখে বিমোহিত হয়ে গেলেন। পতিব্রতা অঞ্জনার সতীত্ব বিনষ্ট না করে পবনদেব তাঁকে শুধুমাত্র স্পর্শ করেই এক সর্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্র উৎপাদন করেন। এই কারণে সমগ্র রামায়ণে হনুমান কোথাও 'পবননন্দন' কোথাও 'মারুতি', কোথাও 'বায়ুপুত্র' ইত্যাদি নামে অবিহিত হয়েছেন। পবনতনয় হলেও হনুমান কপিরাজ কেশরীর ক্ষেত্রজপুত্র।

শৈশব থেকে মহাবলশালী হনুমান। একদিন মা অঞ্জনার অনুপস্থিতিতে ক্ষুধার তাড়নায় বালার্ককে লাল ফল মনে করে খাওয়ার জন্য তার দিকে ধাবিত হন। পবনদেব শীতলতার স্পর্শে সূর্যের তেজ থেকে আত্মজকে রক্ষা করেন। এই সময়ে হনুমান শিশুসুলভ চপলতাবশতঃ ইন্দ্রের ঐরাবতকে দেখে তাকে আক্রমণ করে বসে। ইন্দ্র ঐরাবতকে রক্ষা করার জন্য মৃদু বজ্রাঘাতে হনুমানকে সরিয়ে দিলেন। সেই বজ্রাঘাতে বানরশিশুটি পতিত হলো এক পর্বতে এবং প্রকাণ্ড এক শিলার আঘাতে তার হনু (চোয়াল) যায় ভেঙে। শিশু পুত্রের এই দশা দেখে পবনদেব মহাক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তখন পিতামহ ব্রহ্মা এসে করস্পর্শে শিশুটিকে সুস্থ করে তোলেন। দেবগণ প্রসন্ন হয়ে বর প্রদানে শিশুটিকে মহাশক্তিশালী করে তোলেন। ইন্দ্র বললেন—

'মৎকরোৎসৃষ্ট বজ্রেণ হনুরস্য যথা হতঃ।
নাম্না বৈ কপিশার্দুলো ভবিতা হনুমানিতি।।'

—অর্থাৎ 'আমার হস্ত নিক্ষিপ্ত বজ্রের দ্বারা এর হনুভঙ্গ হয়েছে। অতএব এই কপিশ্রেষ্ঠ "হনুমান" নামে খ্যাতি লাভ করবে।' সূর্য বর দিলেন— "আমার তেজের শত ভাগের এক ভাগ একে দিলাম। যথাকালে একে আমি শাস্ত্রজ্ঞান দেব যার প্রভাবে এ বাগ্মী হবে।" বরুণ, যম, কুবেরাদি দেবতারাও হনুমানকে নানারূপ বর দিলেন। ব্রহ্মাও হনুমানকে বর দিলেন— "বায়ু তোমার এই পুত্র কালে অমিত্রগণের ভয়প্রদ ও মিত্রগণের অভয়প্রদ, অজেয় কামরূপী অব্যাহতগতি ও কীর্তিমান হবে।"

হনুমান অতি সুদর্শন ও মহাজ্ঞানী। হনুমানের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে রামায়ণের "কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে"। সীতার অন্বেষণে রামলক্ষ্মণ যখন পম্পা নদীর তটে উপস্থিত হয়েছেন, তখন ঋষ্যমুখ পর্বতের

উপর থেকে সুগ্রীব, হনুমান এবং অন্যান্য বানরেরা সশস্ত্র রাম লক্ষ্মণকে দেখে ভীত হলো। হনুমান তাদের অভয় দিয়ে রাম লক্ষ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে বাক্যালাপ আরম্ভ করলেন। হনুমানের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, সৌজন্য, শিষ্টাচার ও অতুলনীয় বাকচাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন—

"না নৃগ্বেদ বিনীতস্য না যর্জুবেবদধারিণঃ।
না সামবেদবিদুষঃ শুক্যমেবং প্রভষিতুম্।।
ননু ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধাশ্রুতম্।
বহুব্যাহবতাহনেন কিঞ্চি দপশব্দিতম্।"
(বাল্মীকি রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৩.২৬.২৯)

—অর্থাৎ ইনি (হনুমান) মহাপণ্ডিত, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ-এ পারদর্শী না হলে কেউ এরকম জ্ঞানগর্ভ বাক্যালাপ করতে পারেন না। ইনি নিশ্চয় সমগ্র ব্যাকরণ শাস্ত্রও অধিগত করেছেন। আমার সঙ্গে এত কথা বললেন তবুও একটিও অপশব্দ প্রয়োগ করেননি।

কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান ব্যাকরণ শাস্ত্রের কঠিন সিদ্ধান্তগুলি সূর্যদেবের কাছ থেকে জ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশ্যে এই মহাগ্রন্থ ধারণ করে উদয়াচল থেকে অস্তাচল পর্যন্ত পরিক্রমা করেছেন। শব্দশাস্ত্রে হনুমানের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বালীর মৃত্যুর পর শোক সন্তপ্তা তারাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে যে দার্শনিক বাক্যটি উল্লেখ করেছেন তাহল— "কশ্চ কস্যানুশোচ্যো হস্তি দেহেহস্মিন্ বুদ্বুদোপমে।"

—অর্থাৎ "বুদ্বুদসদৃশ ক্ষণস্থায়ী এই দেহে কে কার নিমিত্ত শোক করবে?" এই বাক্যের মধ্য দিয়ে হনুমানের উপনিষদ ও দর্শনে অসামান্য ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বালী বধের পর রাজ্যলাভ করে সুগ্রীব যখন কামনা বাসনায় মত্ত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে প্রদত্ত পূর্বপ্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হতে বসেছিল, তখন হনুমান সুগ্রীবকে সাম, ধর্ম, অর্থ ও নীতিযুক্ত যে ভাষায় পূর্বপ্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে সীতা উদ্ধারের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাতে হনুমান চরিত্রের কৃতজ্ঞতাবোধ, প্রত্যুপকার, বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্ম রাজনীতিজ্ঞের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার সুগ্রীব যখন মহাবীর হনুমানকে সীতার অনুসন্ধানের দায়িত্ব নেবার অনুরোধ করে বলেন— "হে বীর হনুমান, যাতে সীতার অনুসন্ধান পাওয়া যায় তা অবশ্যই করো। তুমি বিজ্ঞ, রাজনীতিবিদ, বল, বীর্য, বুদ্ধি, বিক্রম সবই তোমাতে আছে। দেশ, কাল-পাত্র অনুযায়ী কখন কি করতে হবে— এসব নীতিতত্ত্বেও তুমি বিশারদ।" এই বাক্যের দ্বারাও আমরা হনুমানের অশেষ বিদ্যা ও গুণের পরিচয় পাই।

রামায়ণের সুন্দর কাণ্ডে দেখি হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করে লঙ্কাপুরীতে গিয়ে, সীতার সন্ধান করে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু সীতা তাঁকে মায়াবী রাক্ষস বলে সন্দেহ করছেন। অবশেষে হনুমানের সহৃদয় কথায় সীতার মনে বিশ্বাস উৎপন্ন হলো। তুলসীদাস বলেছেন—

"কপিকে বচন সপ্রেমে সুনি উপজা মন বিশ্বাস।
জানা মন ক্রম বচন রহ কৃপাসিন্ধু কর দাস।।

তারপর হনুমান সীতাদেবীর কাছে শ্রীরামচন্দ্রের সমস্ত কথা একে একে বললেন। সীতাকে সাহস দিলেন এবং তাঁর মুক্তির দিন সমাসন্ন বলে জানালেন। সুন্দরকাণ্ডের অপর একটি বৃত্তান্তে আমরা হনুমানের চরিত্রের ভক্তিমার্গের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। সীতার অনুমতি নিয়ে হনুমান অশোক কাননের সুমিষ্ট ফল খেয়ে, গাছ ভেঙে উপড়ে লণ্ডভণ্ড করতে থাকলে রাবণের নির্দেশে রাক্ষসবীরেরা বাধা দিতে এসে সব পরাস্ত হয়। রাবণের পুত্র অক্ষয় কুমার নিহত হলে স্বয়ং ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। হনুমান মেঘনাদের অশ্ব, সারথী-কে হত্যা এবং রথ চূর্ণবিচূর্ণ করে মেঘনাদকে মুষ্ঠাঘাতে আহত করেন। মেঘনাদ মূর্ছিত হলে হনুমান তাকে বধ করেননি। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর মেঘনাদ হনুমানের প্রতি অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তুলসীদাস বলছেন—

"ব্রহ্ম অস্ত্র তেহি সাঁধা কপি মন কীনহবিচার।
জোঁন ব্রহ্মসর মানউ মহিমামিটই অপার।।"

—ব্রহ্মাস্ত্র আসতে দেখে হনুমান চিন্তা করলেন যে, এই ব্রহ্মাস্ত্রকে না মানলে তাঁর মহিমার অমর্যাদা হবে। তিনি ভক্তিভরে ব্রহ্মাস্ত্র শরীরে ধারণ করে মূর্ছিত হলেন। এবং ইন্দ্রজিতের বন্ধন স্বীকার করলেন। পরাজয় স্বীকার করে হনুমান ব্রহ্মাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করলেন।

হনুমানের বীরত্বের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আমরা পাই এই কাণ্ডে লঙ্কা দহনের ঘটনার মধ্য দিয়ে। রাবণের নির্দেশে বন্দী হনুমানের লেজে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলে কৌশলে সেই আগুনে তিনি লঙ্কা ভস্মসাৎ করেছিলেন।

হনুমানের আরেক বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্বের পরিচয় পাই অপহৃত রাম-লক্ষ্মণকে পাতালে মহীরাবণের কবল থেকে উদ্ধার করে আনা। একমাত্র হনুমান ছাড়া এই অসাধ্য সাধন আর কে করতে পারে। শক্তিশেলে আহত লক্ষ্মণের প্রাণরক্ষার জন্য বিশল্যকরণীসহ গন্ধমাদন পর্বত রামের শিবিরে নিয়ে আসা একমাত্র মহাবীর হনুমানের পক্ষেই সম্ভব। আপাত দৃষ্টিতে মানবেতর হয়েও হনুমান বীরত্বে, বুদ্ধিমত্তায়, ন্যায়নিষ্ঠায়, কর্তব্যপরায়ণতায়, পাণ্ডিত্যে ভারতবাসীর মনে দেবত্বের আসনে আসীন। এই যুগেও সঙ্কটমোচন হনুমান ভক্তদের সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেন, মনবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তাই দেশে দেশে হনুমানের এত মন্দির, এত ভক্ত। দেশের যুবগোষ্ঠী আজ যদি হনুমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেখবে স্বপ্নের ভারতবর্ষ।।

া বড়ে হনুমান

আছেন। তাই তো তাকে চিরঞ্জীবী বলেও আখ্যা দেওয়া হয়। যেহেতু ভারতবর্ষের সমস্ত নদীগুলির মধ্যে গঙ্গা নদীই সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্র, তাই তিনি গঙ্গার ঘাটেই অবতীর্ণ হয়েছেন। অনেকে মনে করেন হনুমানজী লঙ্কাকাণ্ড বাঁধাবার পর প্রয়াগের গঙ্গার ঘাটে এসেছিলেন বিশ্রাম নিতে। সেই থেকেই মূর্তিরূপে তিনি এখানে বিরাজমান। তবে মূর্তিটিকে সম্পূর্ণ 'মিরাকেল' ও রহস্যময় বলে উল্লেখ করলেন মন্দিরের পরিচালক আনন্দ গিরি। একজন ভক্তের কথায়, "হনুমানজীকে মা গঙ্গার পুত্র হিসাবেও গণ্য করা হয়। প্রতি বছর বর্ষায় হনুমানজী মা গঙ্গার কোলে ঘুমোন। তাই বর্ষাকালে, গঙ্গা তার সমস্ত জল দিয়ে স্নান করিয়ে দেন বজরংবলীর মূর্তিটিকে। তবে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী সারা বছরই নিজেদের উৎসের দ্বারা জল দেন পবনপুত্রকে। বর্ষাকাল শেষ হলেই মন্দিরের ভেতর জমে থাকা গঙ্গার জল আপনা আপনিই কমে যায় এবং অবশিষ্ট জল মন্দির কর্তৃপক্ষ 'পাম্পে'র সাহায্যে বের করে দেন। জল বের করার পর মূর্তিটিকে মেরামতও করা হয়।"

স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, বজরংবলী আজও ক্রমাগত রক্ষা করে চলেছে শহর ও শহরবাসীদের। তিনি দৃশ্যমান না হয়েও লক্ষ্য করে চলেছেন প্রত্যেকের উপর। তাইতো ২০ ফুট লম্বা ও ৯ ফুট চওড়া মূর্তিটিকে 'নগর কোটওয়াল' বা 'শহরের রক্ষাকর্তা'র আখ্যা দিয়েছে প্রয়াগের সাধারণ মানুষ। বজরংবলীর মূর্তিটির মধ্যেও ধরা পড়েছে ত্রেতাযুগের একটা ছাপ। মূর্তিটির ডান পায়ের নীচে স্থান পেয়েছেন রাবণ পুত্র অহিরাবণ যাকে খারাপ চিন্তা ও অশুভর লক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। মূর্তিটির বামদিকে আছেন কামদা দেবীর মূর্তি। যিনি ভক্তের সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ করেন বলে প্রচলিত। হনুমানজীর মাথার উপরে বামদিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে রাম-লক্ষ্মণের মূর্তি। এছাড়াও মন্দিরটিতে হনুমানপুত্র মকররাজের মূর্তিও দেখা যাবে।

দেশদেশান্তর থেকে প্রত্যেকদিন লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয় মন্দির প্রাঙ্গণে। তবে অন্যান্য দিনের তুলনায় মঙ্গলবার ভক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় দ্বিগুণ। গোটা দেশের মানুষ এই দিন জড়ো হন মন্দির প্রাঙ্গণে নিজেদের যন্ত্রণা, ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা বজরংবলীকে জানাবার জন্য। তাইতো, যাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে তাদের নামও রেজিস্টারে নথিভুক্ত করে রাখেন মন্দির কর্তৃপক্ষ।

প্রত্যহ ভোর চারটে থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হয় আরতি। বিকাল ৪ ঘটিকায় নিবেদন করা হয় শৃঙ্গার আরতি। অবশেষে রাত্রি ৮টায় মহাআরতি বা শায়ন আরতি আয়োজিত হয়। ভগবানের পুজায় নিবেদন করা হয় দুধ, বেশনের লাড্ডু, প্যাঁড়া ও ফলমূল। মন্দিরের মহান্ত বা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত পূজারী ব্রাহ্মণেরাই করেন হনুমানজীর পুজো।

মন্দিরটি পরিচালনার দায়িত্বে আছে 'বাগমবরি গদি প্রয়াগ।' ভক্তদের দানের মাধ্যমেও পরিচালিত হয় মন্দিরের কাজকর্ম। এছাড়া মহান্ত বিচারানন্দ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় নামক একটি স্কুলও চালায় মন্দির পরিচালনা সমিতি যেখানে প্রায় ১০০ জন ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে শিক্ষাদান করা হয়। বড়ে হনুমানজীর মহিমা বর্তমানে ভারতবর্ষই নয়, ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে পড়েছে গোটা বিশ্বের দরবারেও। এক অভূতপূর্ব নিদর্শন স্থাপন করেছেন "লেটে হুয়ে হনুমানজী"।

চিঠিপত্র

জাতীয় ভোটার দিবস

আগামী ২৫ জানুয়ারি সারা দেশে জাতীয় ভোটার দিবস পালন করবে নির্বাচন কমিশন। সারা দেশে নির্বিঘ্নে ভোট সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কমিশনের প্রতিষ্ঠার দিনটাকে স্মরণ রেখে দেশের সমস্ত ভোটারকে নিজ বুথে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার শপথ বাক্য পাঠ করানোর অভিনব সিদ্ধান্তকে বাহবা জানাতেই হয়। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে এ জাতীয় অনুষ্ঠান অবশ্যই নতুন মাত্রা এনে দেবে তা বলা যায়। কারণ এরাজ্যে নির্বাচনে সন্ত্রাস, রিগিং, বুথ দখল নতুন কোনও ঘটনা নয়। প্রশাসনকে হাতিয়ার করে বাম জমানায় নির্বাচন যেন প্রহসনে পরিণত হয়েছে। তাই নির্বাচন কমিশনের কঠোর পদক্ষেপ ও প্রশাসনিক তৎপরতা ছাড়া এ রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব নয়। সে কারণে জাতীয় ভোটার দিবসে ভোটারদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কতটা গুরুত্ব পাবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। এ কথা ঠিক যে এ রাজ্যের সচেতন মানুষ নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে সর্বদাই অগ্রণী ভূমিকা নেন। গত কয়েকটি নির্বাচনে এ রাজ্যে তার প্রতিফলনও ঘটেছে। তবে ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও নির্বাচন কমিশনের অন্যতম দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের মাধ্যমে যেখানে রাইটার্স দখলের প্রশ্ন থেকে যায়, যে নির্বাচনে লাল সন্ত্রাসের মাধ্যমে জিতে এ রাজ্যে দীর্ঘদিন লালদুর্গ অটুট রয়েছে সেখানে সহজে বশ্যতা স্বীকার করবেন না বামনেতৃত্ব, তা সহজেই অনুমেয়। তাই বিনাশকালে তাদের কুৎসিৎ রূপটা প্রকাশ্যে আসা অস্বাভাবিক নয়। সেক্ষেত্রে ভোটারদের নীরব দর্শকের ভূমিকা নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তাই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নেওয়া জাতীয় ভোটার দিবস অনুষ্ঠান এ রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে কাকতালীয় ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। বামফ্রন্ট সরকার নিয়ন্ত্রিত রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষতা আশা করা যায় না।

তাই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনিক স্তরে দৃঢ় পদক্ষেপ নিলে তবেই জাতীয় ভোটার দিবসের কার্যকারিতা সার্থক হবে, নচেৎ নয়।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

ত্রিবিধ বিপদ

৬৩ বৎসর যাবত প্রকাশিত পত্রিকাটি সম্বন্ধে মাত্র ৬/৭ মাস হয় পরিচয় হয় এবং গ্রাহক হই। সীমিত প্রচারবশতই তা ঘটেছে। কয়েকটি সংখ্যা পড়েই বুঝতে পারি, এটাই হিন্দুত্বের একমাত্র মুখপাত্র। দেগঙ্গায় এবং তৎপূর্বে হরিণঘাটায় হিন্দুদের উপর যে ৩/৪ হাজার মুসলিম আক্রমণ ঘটে ব্যাপক হারে, শাসক এবং সমস্ত মিডিয়া তা চেপে যায়।

'হিন্দুদের স্বার্থ'— এই কথা উচ্চারণ এখন ক্ষতিকারক এবং এর জন্য হিন্দু শাসক ও গণমাধ্যমই দায়ী।

পশ্চিমবঙ্গ আবার ৩৪ বছর নয় আজ ৬০ বছর ধরেই কম্যুনিস্টদের অত্যাচার ও উপদ্রব সহ্য করে চলেছে এবং এবং পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের Sattelite-এ পরিণত করে ফেলেছে।

এই ভয়ঙ্কর দানবকে উৎখাত করা এখন সর্বাপেক্ষা জরুরী। নচেৎ আমরা সম্পূর্ণভাবে বিপন্ন হবো। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলির এ সম্বন্ধে মাথা ব্যথা কম। হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে মার খেয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে অনাদৃত রয়েছেন। এঁদের সবারই শ্যামাপ্রসাদের কথা স্মরণ রেখে হিন্দু প্রতিষ্ঠানকে শক্ত করা উচিত ছিল— তাঁরা না করে কম্যুনিস্ট কবলিত হয়েছেন এবং কিছুতেই নিজেদের স্বার্থ বুঝছেন না। শত্রুকেই বন্ধু ভাবছেন।

এই পরিস্থিতিতে সর্বাগ্রে ধূর্তদেরকে বিদায় করাই প্রধান কাজ। বাঙ্গালীরা আত্মঘাতী বলেই বিজেপি কিছু করে উঠতে পারছে না।

একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। কংগ্রেস কেন বামেদের সাহায্য করছেন— অনেকে ধরতে পারছেন না। উদ্দেশ্য ওদের দিয়ে বিজেপি-র [illegible] নষ্ট করা। কারণ গালিগালাজে ও কুবুদ্ধিতে ওদের জুড়ি নেই। বাবরি ধাঁচা ও গুজরাট নিয়ে এঁরা প্রতিদিন সুযোগমাত্রই সঙ্ঘ পরিবারকে গাল দিচ্ছে। দলে দলে গুজরাট নিয়ে কাল্পনিক কাহিনী ভরা বই লিখেছে। নরেন্দ্র মোদীকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে পর্যন্ত দেয়নি। অথচ কাশ্মীরের পণ্ডিতদের দেখতে কেউ যায়নি। ১০০০ (ভিন্ন মতে ১৫০০) হিন্দু-মুসলমান সব দাঙ্গা ও পুলিশের গুলিতে মারা যায়। একে এরা pogrom (সংগঠিত হত্যাকাণ্ড) বলে চিৎকার করে, অথচ ৫০০০ শিখকে দিল্লীতে কংগ্রেস ১৯৪৮-তে হত্যা করে সে বিষয় নীরব। জ্যোতি বসুর প্রতিষ্ঠা ৬০ বছরেও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে একটুও ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—কন্টক যত ক্ষুদ্রই হোক, তার বিদ্ধ করার ক্ষমতা আছে। অনবরত মিথ্যা প্রচারে এরা বাঙ্গালীদের মন বিষিয়ে দিয়েছে— তাই প্রত্যেকের মুখে এক কথা, বি জে পি 'কম্যুনাল'। সর্বত্র এত শিকড় প্রসারিত করেছে এরা এবং শুধু গুন্ডা ও পুলিশ দিয়ে হিন্দু বাঙালীদের মারছে। চিদাম্বরম্ একে 'killing field' বলেও সর্বত্র এদের সহায়তা করে চলেছে। ওরা এই স্টেটটা ওদের দিয়ে দিয়েছে। সাত সাতবার ওয়াকওভার দিয়ে এদের রাজত্ব কায়েম রেখেছে শুধু এই রাজ্যে বিজেপি-র প্রসারে বাধা সৃষ্টির জন্য। অবশ্য সারা ভারতে ক্রমশঃ এদের নিজেদেরই অস্তিত্ব লোপ পাবার মুখে। ২জি-কে কেন্দ্র করে মায়ে-পোয়ে এরা এখন কারাতের ভরসায়—নিজেরাই গালিগালাজে নেমেছে। যাইহোক হিংসাকে রুখতে হিংসাই দরকার, মমতার দল তাই করছেন—এদের এখন ভয় একমাত্র মমতাকেই। নইলে এদের হঠানো কঠিন। প্রায় দুই লক্ষ কোটি টাকা ঋণ রেখে ভিখিরি বানিয়ে দিয়েছে আমাদের— তবুও কিছু লোকের চৈতন্যই হচ্ছে না। বাঙ্গালীদের বিপদ ত্রিবিধ— মুসলমান, কম্যুনিস্ট, কংগ্রেস।

গুণ্ডাবাজদের সরাতে পারলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। তাই প্রথম প্রকৃত দুষ্টদের লোকে যে চিনতে ভুল করছে—তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই পত্র।

—ভূপতিচরণ দে, সার্ভে পার্ক, কলকাতা।

আর এস এস ও হার্মাদ

অতি সম্প্রতি বাংলার একটি দৈনিকের জনৈক 'সুকুমার মিত্র' আর এস এস ও হার্মাদদের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন আবিষ্কার করেছেন। খবরটিতে তিনি উল্লেখ করেছেন 'ভারত সরকারের বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থা' ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিশ্বস্ত সূত্রের কথা। কিন্তু ওই লেখককে বারংবার ফোন করা সত্ত্বেও 'বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থাটি'র নাম উদ্ধার করা যায়নি। টেলিফোনে তার উত্তর ছিল এরকম-'কে আপনি'? 'আপনাকে কেন উত্তর দিতে যাব?' 'বারবার ফোন করে চ্যাংড়ামি করছেন?' এছাড়াও বহু লেখার অযোগ্য ভাষা মিত্রবাবু ব্যবহার করেছেন।

একজন সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক হাতে তথ্য ও প্রমাণ ছাড়া কিছুই লেখেন না। 'সুকুমার মিত্র' হয়তো সেই দলেই পড়তেন। তথ্যনিষ্ঠ প্রতিবেদনের জন্য ধন্যবাদ বা সাবাস জানালে ফোনের অন্যপ্রান্তে ভেসে আসতো কৃতজ্ঞতা ও বিনয়। কিন্তু কথায় আছে— 'কোনও ইতর জীবের হাতে যেন তরবারি তুলে দিতে নেই...'। সুকুমার মিত্রেরও বর্তমানে সেই অবস্থা। তরবারি কোথায় ব্যবহার করছেন বোধহয় ভুলে গেছেন। তাই আর এস এস-কে বদনাম করতে হার্মাদের সঙ্গে সম্পর্কের এক সুপরিকল্পিত মিথ্যা তৈরি করেছেন।

—রাজু হালদার, জামালপুর, বর্ধমান।

দৈনিক পত্রিকা

আমি স্বস্তিকা'র দীর্ঘদিনের পাঠক, বিগত কয়েকটি সংখ্যায় দেখছি স্বস্তিকা'কে দৈনিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশ করবার জন্য পাঠকদের আকুল আবেদন। প্রত্যেক দেশপ্রেমী বঙ্গবাসীরই আজকের উপলব্ধি—একটা জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্রিকা চাই।

বাজারে প্রায়ই নতুন নতুন দৈনিক কাগজ বেরুচ্ছে। অথচ কোনও জাতীয়তাবাদী কাগজের খোঁজ নেই। 'স্বস্তিকা' যেমন চলছে তেমনই থাকুক। কিন্তু ওই ধরনেরই অন্যনামে কোনও দৈনিক কাগজ বের হোক।

এখানে যাঁরা জাতীয়তাবাদী রাজনীতি করেন, তাঁদের কাছে আমার প্রশ্ন— তাঁদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কি চান না— বাংলা থেকে কোনও নেতৃত্ব উঠে আসুক। কংগ্রেস দলে যেমন সুভাষচন্দ্রের পর আর কারুরই সভাপতির হবার সুযোগ আসেনি, তেমনি সাবেক জনসঙঘ বা আজকের 'ভারতীয় জনতা পার্টি'তে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পর সভাপতি পদে একজনও বাঙালী নেই কেন?

আর এ কারণেই কি একটি জাতীয়তাবাদী দৈনিক কাগজ প্রকাশে এত অনীহা! ব্যাপারটা নিয়ে ভাববেন।

—শ্যামল কুমার দাশ, রবীন্দ্র সরণী, শিলিগুড়ি।

দুর্গাপুর সমাজ সেবাভারতীর বার্ষিক সম্মেলন

ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন গুরুশরণজী। পাশে পরিষদের সভাপতি ভরতভূষণ।

সমাজ সেবা ভারতীর অনুমোদিত দুর্গাপুরের বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান গত ২১ নভেম্বর ইছাপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ১৪টি প্রকল্পের ছাত্র-ছাত্রী ও কার্যকর্তাগণ। অঙ্কন, আবৃত্তি, সুভাষিত ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, গ্রাম পরিক্রমা, পরিশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ দিয়ে কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনাও দেওয়া হয়। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী সত্যব্রতানন্দ মহারাজ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর শ্রী গুরুশরণ প্রসাদজী এবং সভাপতি ছিলেন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শ্রী ভারতভূষণ। প্রায় ২০০০ লোকের উপস্থিতিতে ওই অঞ্চলের সব থেকে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে এই বার্ষিক অনুষ্ঠান। সেবা ভারতীর সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রীদের শংসাপত্র দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মলয় কালী।

উদয়শঙ্কর নৃত্যোৎসব

গত ৮ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত সাতদিন ব্যাপি উদয়শঙ্কর নৃত্যোৎসবের আয়োজন করেছিল 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি'। এই অনুষ্ঠান রবীন্দ্রসদন এবং রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিল 'পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য সমিতি সমন্বয়'।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত খাতড়া নগর ব্যবস্থা প্রমুখ গঙ্গাধর দে গত ২৩ নভেম্বর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলনিধি বাবদ ৫০০ টাকা তুলে দেন মহকুমা বৌদ্ধিক প্রমুখ সুভাষচন্দ্র দত্তের হাতে।

* * *

আর এস এসের পূর্ব কলকাতার রামমোহন নগর ব্যবস্থা প্রমুখ প্রদীপ পাড়ুইয়ের বিবাহ উপলক্ষে প্রদীপের মাতৃদেবী শ্রীমতী কমলা পাড়ুই সেবা কাজের জন্য ভগিনী নিবেদিতা সেবাভারতীকে এক হাজার টাকা মঙ্গলনিধি হিসেবে প্রদান করেন।

* * *

১০ ডিসেম্বর মালদা নগরের স্বয়ংসেবক অর্ণব সরকার ঈশিতার সঙ্গে তার বিবাহ উপলক্ষে বৌভাতের দিন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ৫০০০ টাকা অক্সিজেন সিলিন্ডার কেনার জন্য মঙ্গলনিধি হিসেবে দান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত ও প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকারের হাতে অর্থ তুলে দেন অর্ণবের পিতা প্রদ্যুৎ সরকার।

সমাবেশ সমাচার

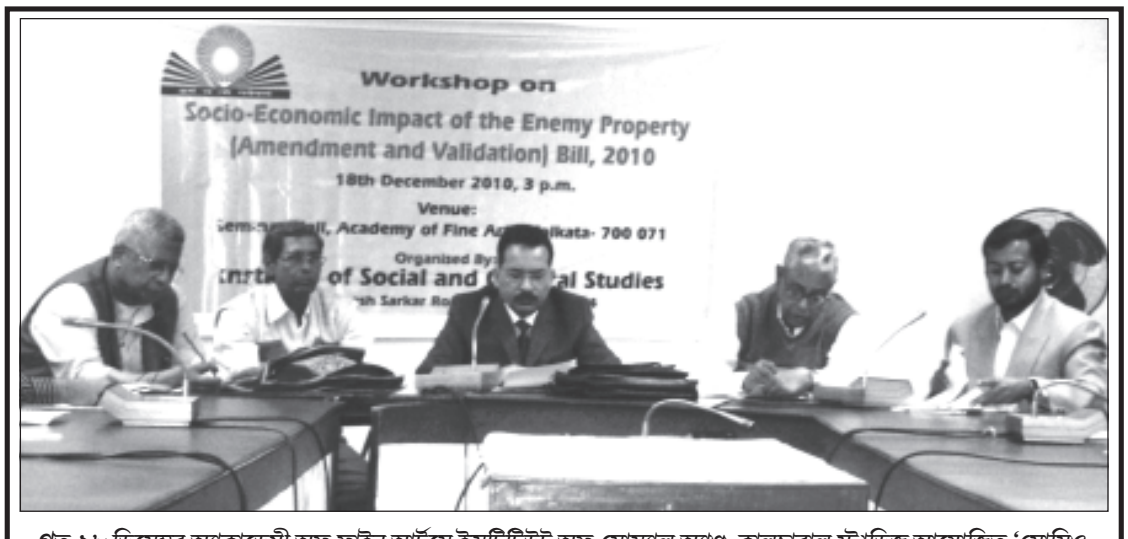

গত ১৮ ডিসেম্বর অ্যাকাডেমী অফ্ ফাইন আর্টসে ইন্সটিটিউট অফ সোস্যাল অ্যাণ্ড কালচারাল স্টাডিজ আয়োজিত 'সোসিও ইকোনমিক ইমপ্যাক্ট অব্ দ্য এনিমি প্রপার্টি (অ্যামেনমেণ্ড অ্যাণ্ড ভ্যালিডেশন) বিল ২০১০' শীর্ষক আলোচনাচক্রে উপস্থিত তথাগত রায়, গৌরচন্দ্র গড়াই, জয়দীপ রায় (মাঝে), ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ ডাঃ গুরুপদ শাণ্ডিল্য ও রবিরঞ্জন সেন।

স্বামী বিবেকানন্দের আলোকে

বেদান্ত : জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি

শৌর্যধ্বজ সৌকালিন ঘোষ

একটি সমাজ বিভিন্ন বি(োস ও ধারার সমন্বয়ের যজ্ঞ(ত্র। সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচার আচরণ সেই সমন্বিত ধারার ভিত্তি নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাংস্কৃতিক রীতি নীতিগুলি যা সুদীর্ঘকাল হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত সেই সনাতন ধারাটি ভারতবর্ষের ঐক্যের মূল ভিত্তিভূমি একথা অনস্বীকার্য। একথাও এর সঙ্গে স্মরণে রাখতে হবে যে সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক নিয়মনীতিগুলিরও ভারতীয় রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি র(ায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তবে ভারতীয় রাষ্ট্রে ধর্মীয় বি(োসের সমন্বয়ের ধারাকে স্বামীজী সর্বাধিক গু(ত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, ''প্রত্যেক জাতিই প্রাকৃতিক নিয়মে কতগুলো বিশেষত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। সমস্ত জাতি মিলে যেন এক মহা ঐক্যতান বাজনার সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক জাতিই যেন ওতে এক একটা আলাদা আলাদা সুর যোগ করছে। ওটাই তার জীবনশক্তি(। ওটাই তার জাতীয় জীবনের মে(দণ্ড মূলভিত্তি। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমির মূলভিত্তি মে(দণ্ড বা জীবনকেন্দ্র একমাত্র ধর্ম।'' (বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ৭০৭)।

পাশ্চাত্যে রাষ্ট্র নির্মাণে রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। যদিও বর্তমানকালে পশ্চিমেও ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাব পরিলি(ত হচ্ছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ান গঠনের সময় খৃষ্টীয় রীতিনীতিকে যথেষ্ট গু(ত্ব দেওয়া হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ানে তুরস্কের আপে(ক অস্বচ্ছন্দ্য সর্বজন জ্ঞাত। ভারতবর্ষ আবহমান কাল ধরেই ঋষিভূমি, দেবভূমিরূপেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় মানুষের হৃদিমন্দিরে পূজিত হয়ে এসেছে। সাধারণ মানুষ শি(ত, অশি(ত নির্বিশেষে এদেশটিকে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ(, বুদ্ধ, মহাবীর, আদি শঙ্করাচার্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, রামকৃষ(-বিবেকানন্দ, নিগমানন্দ, অরবিন্দের দেশ হিসাবেই চেনে। সেজন্যই স্বামীজী বেদান্তকেই ভারতীয় জাতিসত্ত্বার ভিত্তিভূমি হিসাবে জোর দিয়েছিলেন। বেদের ওঙ্কারকেই তিনি শাক্ত(, শৈব, বৈষ(ব, লিঙ্গায়েত, গাণপত্য তথা সকল সম্প্রদায়ের ঐক্যের প্রতীক হিসাবে নিয়েছিলেন। কারণ, সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সকলেই ওম্ মন্ত্র উচ্চারণান্তেই গৃহদেবতার পূজনপর্বের সূচনা করেন।

স্বামীজী অনুভব করেছিলেন যে একটি রাষ্ট্র যদি তার সুমহান সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে উদাসীন থাকেন তাহলে সে জাতির জাগরণ সম্ভব নয়। বেদান্ত একটি প্রাচীন দর্শন যা সর্বজন স্বীকৃত। স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় ছিল কঠ উপনিষদ্ তেমনই রবীন্দ্রনাথের ছিল ঈশ উপনিষদ্। তাই বেদ-উপনিষদ্‌কে আজ এই নববেদান্তের রূপায়ণের যুগে যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। বৃটিশ প্রবর্তিত শি(া-ব্যবস্থায় শুভদিক যেমন ছিল তেমন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি(র এ প্রচেষ্টাও ছিল যে ভারতীয় সনাতন পরম্পরাকে সচেতনভাবেই হেয় প্রতিপন্ন করা। স্বামীজী সে প্রচেষ্টাকে বেদান্তের দর্শন ও শি(ার নিরীখে বি(-ষণ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি(র মূল উদ্দেশ্যটিকে দেশবাসীর সামনে উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন।

আমাদের একশ্রেণীর নবসংস্কারকদের ন্যায় যাঁরা বেদান্তকে আধুনিক কালের জাতিগঠনের কার্যে অন্তরালে রাখার প(পাতি তাঁদের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেননি।

স্বামীজী বেদান্তের ধর্মকে সার্বজনীন ধর্মের রূপ বলেই মনে করতেন কারণ বেদান্তের দর্শনে বৈরিতা শেখায় না। আমার ধর্মই সত্য, আমার বি(োসই একমাত্র পৃথিবীতে বিরাজ করবে— সকল অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষকে ছলে বলে কৌশলে আমার ধর্মের ছত্রছায়ায় আনতেই হবে, না হলে জগতে প্রলয় ডেকে আনতে হবে। তাই স্বামীজী মুক্ত(কণ্ঠে বলেছেন যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল সনাতন ধর্মের শি(াতে কোথাও বলা নেই যে হিন্দু একাই স্বর্গের অধিকারী বা তাঁরাই মৃত্যুর পর পরিত্রাণ পাবে— অন্যেরা নরাধম তাই নরকগামী হবে। বেদান্ত ধর্মের শুদ্ধ পবিত্র শান্ত সর্বজনগ্রাহ্য রূপটিই তাঁর অনুসরণকারীকে শেখায়। ধর্ম পুণ্যভাবের পূর্ণরূপ তাই তার চরম আদর্শ সরলতায় আবৃত। হিন্দু ধর্ম চিরকাল এক অপূর্ব উদারতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে এবং দিয়েছে বলেই ভারতীয় ইতিহাসের ধারা অনুধ্যান করলে আমরা দেখতে পাই যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম ভাব এখানে প্রচার প্রসার লাভ করেছে। ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রমাণ করে দেয় হিন্দু সমাজের সহনশীল উদার রূপটি। মুসলমান প্রধান দেশে জনগণনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ত্র(মে হ্রাসমান অনুপাত প্রমাণ করে এঁদের সাম্প্রদায়িক চরিত্রটি। হিন্দু ধর্ম কখনই ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতিকে ঐতিহাসিক ভাবেই প্রশ্রয় দেয়নি। ভাব গম্ভীর হিন্দু ধর্ম ব্যক্তি(র বৌদ্ধিক উন্নতিকেই পাথেয় হিসাবে নিয়ে চলেছে প্রাচীনকাল থেকেই। পৃথিবীর বুকে প্রাচীনতম জননীস্বরূপ হিন্দু ধর্মের বির্বতনের ধারায় অতি সম্প্রতি রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করতে দেখা যাচ্ছে। কারণ খৃস্টান ও মুসলমানদের নিয়ে সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি মাত্রাহীনভাবে অনুশীলনের প্রক্রি(য়াটি ভারতে আধুনিক কালেই শু(হয়। মধ্যযুগে মুসলমান শাসকরা ও পরে বৃটিশ শাসনকালে ইংরেজ সাহেবরা যথেচ্ছভাবে হিন্দুবিরোধী ধারার সূত্রপাত রাজনীতিতে করে গিয়েছেন। তথাকথিত ধর্মনিরপে(রাজনৈতিক দলগুলি সেই ধারাই অনুশীলন করছে সীমাহীন (মতার লালসা চরিতার্থ করতে। তাঁরাই ধর্মের মধ্যে কলহ, উন্মাদনা, সাম্প্রদায়িকতাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে। ধর্মকে রাজনৈতিক রূপদান করার প্রক্রি(য়াটি সমগ্র বি(েই বহুকাল ধরে চলেছে। ভারতবর্ষে তার ছায়া এসে পড়ছে প্রতিক্রি(য়া রূপে। তাই ধর্মকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার প্রথমে শু(করে খৃস্টান ও মুসলমান প্রধান দেশগুলিই। তার ফলেই ধর্মের সর্বজনগ্রাহ্য

সার্বজনীনরূপটি কালিমালিপ্ত হয়। তাই স্বামীজী বলেছিলেন, ''প্রত্যেক নরনারীকে— সবাইকে ভগবানের চোখে দেখতে থাকো। তোমরা কাউকেও সাহায্য করতে পারো না, শুধু সেবা করতে পারো, প্রভুর সন্তানদের যদি সৌভাগ্য হয় তবে স্বয়ং প্রভুর সেবা কর।'' ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনকালেই ব্যক্তি(স্বাধীনতার আদর্শ, পাশ্চাত্য ধাঁচে আধুনিকতার দী(ার সঙ্গে রাজনীতিতে পশ্চিমী ধ্যানধারণার সাথে এদেশের নেতৃত্বের পরিচয় ঘটে। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতে উচ্চবংশীয় ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ হতে আসা নেতৃত্ব পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তার ধারণাগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বি(োস করতে শু(করে যে প্রাক-বৃটিশ প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি(স্বাধীনতার বিকাশ সাধন অসম্ভব। ধর্মকে ভারতীয় বি(োসের মূলভিত্তি হিসাবে স্বীকার করতেও তাঁদের আড়ষ্টতা ছিল স্পষ্ট। নেহে(বাদী ও নিরী(েরবাদীরা ভেবেছিলেন ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতিগুলি কালক্র(মে পশ্চিমীধারার শি(ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়বে এবং পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্রের ছত্রছায়ায় এক আধুনিক জাতির জন্ম হবে যেখানে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি হবে সেই নবভারতীয় জাতির মূল চালিকা শক্তি(। ধর্মের ভূমিকা গৌণ হয়ে আসবে। এই আদর্শে দী(ত ভারতীয় নেতৃত্বের প্রভাবশালী অংশ যখন ভারতীয় সংবিধান রচনায় ব্রতী হলেন তাঁরা উদারভাবে পশ্চিমের বিভিন্ন সংবিধান থেকে অনুপ্রেরণা নিলেন, কিন্তু স্বদেশের সুমহান সুপ্রাচীন ভারতীয় দর্শন বেদ, উপনিষদের আলোকে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় পূর্ব ও পশ্চিমের শুভ প্রচেষ্টাগুলির সমন্বয়ের ধারার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আত্মাকে যুক্ত(করার টান অনুভব করলেন না। ফলে সংবিধান রচনার উপর থেকে ভারতবর্ষীয় ধারায় বি(োস ভারতীয় নেতৃত্ব নব উদ্যামে সংবিধানের মধ্যে সনাতন ভারতীয় ধারার প্রতি উদাসীনতার প্র(াটি জোড়ের সাথে সামনে নিয়ে আসতে শু(করলেন। কালক্র(মে শ্যামাপ্রসাদের মতালম্বী দলও মতটির বিকাশও প্রসার ঘটতে লাগল এবং তাঁরা জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হতে থাকলেন। মধ্যযুগীয় ভিনদেশীয় মুসলমান রাজন্য শ্রেণীর পীড়ন থেকে মধ্যপন্থায় বি(োসী নেতৃত্বের প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি শুচিবাইগ্রস্ত আচারণ উভয়ই জনমানসে তার প্রভাব ফেলল। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু দমন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও হিন্দুর স্বার্থ র(াকারী শক্তি(র ক্র(মশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকল। ভারতীয়তার উপর গু(ত্ব আরোপ করে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে মধ্যপন্থী দলগুলির সঙ্গে প্রায় সমানে সমানে টক্কর দেবার মতো শক্তি(শ্যামপ্রসাদের দর্শন বি(োসী দলগুলি অর্জন করে নিল।

স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু মধ্যপন্থায় বি(োসী পশ্চিমের ভাবধারায় আপ্-ুত রাজনৈতিক দর্শনগুলির কাছে আত্মবিসর্জন করেননি যেমন দ(ণপন্থায় বি(োসী র(ণশীল ধ্যানধারণার কাছেও আত্মসমর্পণ করেননি। পূর্ব ও পশ্চিমের শুভ ধারাগুলির সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল বিবেকানন্দের দর্শনে। তাঁর 'বৈদান্তিক সমাজতন্ত্রের' দর্শনটি ছিল ভারতীয় জনসাধারণের আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি(র দিক নির্দেশক। আমরা তাকে গ্রহণ করতে পারিনি। (রাজনীতির অঙ্গনে স্বামীজীর ভাবের প্রতিনিধি ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্রের পর শ্যামাপ্রসাদও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের বাণী থেকে। রাজনীতি থেকে তাঁদের অকালে মহাপ্রস্থানের ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে স্বামীজীর দর্শনের সার্থক বিকাশের ধারাটি ব্যাহত হয়ে পড়ল। সেই ধারাটির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দরকার যুব সমাজের মধ্যে বিবেকানন্দের মত ও পথটিকে ছড়িয়ে দেবার কর্মযজ্ঞে আত্মনিবেদন। সকল বিবেকানন্দ অনুরাগীর আজ তাঁর শুভ জন্মদিনে এই মন্ত্রদী(া নেবার প্রয়োজন এসেছে যে বিবেকানন্দের বাণীকে নব উদ্দামে মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। যুব সমাজকে স্বামীজীর মন্ত্রে দী(ত করতে হবে তবেই ভারতবর্ষ আবার জগত-সভায় তার হৃতসম্মান ফিরে পাবে। 'দুর্গং পথস্থ কবয়োঃ বদন্তি' সমস্ত বিবেকানন্দ অনুরাগী মানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে এ দুর্গম পথেই আমাদের নতুন উষার দিকে এগিয়ে যেতে হবে, সেখানে আমাদের কাজ হবে সমাজকে কেন্দ্র করে। রাজনীতিকে করতে হবে অধ্যাত্মবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। আমাদের মঞ্চে সকলের মধুর নিমন্ত্রণ থাকবে। প্রেমের দানে পাত্রকে পূর্ণ করতে হবে কারণ সে দানই সার্থক হবে। পরের মাঝে নিজেকে আর আত্মার মাঝে বি(েমানবতাকে খুঁজে পাওয়ার মধ্যে রয়েছে বিবেকানন্দের প্রতি শ্রেষ্ঠ নিবেদন। অন্তরের এই শিবস্বরূপকে সত্যরূপে উপলব্ধি করে অহংবোধকে পরিহার করে সার্বজনীন কর্মে ব্রতী হতে হবে। কর্মহীনতার মধ্যেই কলহ আছে, নিষ্কামকর্মের মন্ত্র দী(ার মধ্যেই রয়েছে শক্তি(ও সিদ্ধি। তাই উদাসীনতার বিলাসিতা থেকে বেড়িয়ে কর্মসমুদ্রে অবগাহন করার লগ্ন উপস্থিত। শান্ত মনে শিব মন্ত্রে দী(া নিয়ে এই দূর্গম পথের যাত্রী হতে হবে, শুভকর্ম সাধনার দ্বারা (াভ-বি(াভ-সন্ত্রাস-বিপদের উর্দ্ধে উঠে মঙ্গলনিকেতনের দ্বারে পৌঁছতে হবে যেখানে বিবেকানন্দকে বিবেকে স্থাপন করে অপরাজিত হৃদয়ে মঙ্গলকে ধারণ করে জগতের সকল কর্মেই সেই শিব সত্যকে উপলব্ধি করার শক্তি(অর্জন করতে হবে। তবেই স্বামীজীর বেদান্ত দর্শনে নিজেকে রাঙিয়ে ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের পথে আমরা এগোতে পারব। স্বামীজী বলেছিলেন, ''বেদান্তের আদর্শ শুধু ভারতবর্ষে না, বাইরেও ছড়াতে হবে। লেখার মধ্যে দিয়ে নয়, মানুষের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক জাতির মানসিক কাঠামো তৈরি করতে আমাদের চিন্তাধারা সঞ্চার করতে হবে।''

(বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-৬৭১)

।। স্বামী বিবেকানন্দের ১৪৮তম জন্মবার্ষিকী উপল(প্রকাশিত।।

সার্ধশতবর্ষ স্মরণে

কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এক স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিত্ব

ইন্দিরা রায়

আজ থেকে সার্ধশতবর্ষ আগে এই বাংলা তথা ভারতে ঘটেছিল সুবর্ণযুগের সূচনা— বিভিন্ন ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন কিছু ব্যক্তিত্ব, যাঁরা আজও উজ্জ্বল ও অমর হয়ে আছেন দেশবাসীর মনে। এই বছরে তাঁদেরই জন্ম-সার্ধশতবর্ষ পূর্তি পালন করা হচ্ছে শ্রদ্ধার সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের দেড়শো বছর সমারোহে পালিত হচ্ছে দিকে দিকে, কিন্তু প্রথম মহিলা প্রবেশিকা পাশ ও প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী বসু;পরবর্তী জীবনে যাঁর পরিচয় হয় কাদম্বিনী গাঙ্গুলি হিসেবে — তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো তো দূরের কথা, বেশিরভাগ মানুষই তাঁর কথা জানেন না।

পৈতৃক নিবাস ছিল অবিভক্ত বাংলায়। পিতা ব্রজকুমার বসু ছিলেন শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। ভাগলপুরে থাকাকালীন কাদম্বিনী জন্মগ্রহণ করেন। ছোট থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। কলকাতার বালিগঞ্জের বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। ১৮৭৭-এ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনিই একমাত্র প্রথম মহিলা, যিনি বেথুন স্কুল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেছিলেন। এক নম্বর কম পাওয়ায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তবে একমাত্র মহিলার প্রবেশিকা পরীক্ষা ও পরবর্তী সময়ে

তিনি ও চন্দ্রমুখী বসুর বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ঘটনা সমগ্র ভারতে ছিল এক বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব ঘটনা।

এইভাবে তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুসমাজে বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে কোনও মহিলার পক্ষে এভাবে শিক্ষালাভ ছিল অভাবনীয় ঘটনা এবং তার জন্য তাঁকে রীতিমতো 'লড়াই' করতে হয়েছিল। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় লড়াই চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে। তখনকার সমাজে চিকিৎসাজগতে চিকিৎসক হিসেবে মহিলাদের প্রতি ব্রাত্য মনোভাব পোষণ করা হোত। ১৮৭৮-এ দু'জন বাঙালি কন্যার আবেদনপত্র জমা পড়েছিল, তাতে তাঁরা জানিয়েছিলেন যে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে চান। তাঁদের মধ্যে একজন কাদম্বিনী বসু ও আরেকজন দুর্গামোহন দাসের মেয়ে সরলা। শুধু প্রবেশিকা পরীক্ষায় নয়, দু'জনের অভিভাবকই মেয়েদের ডাক্তারি পড়বার অনুমতি দিয়েছিলেন। অনেক উদার ব্যক্তি সে সময়ে নারীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি চাইলেও ধর্মীয় বাধা ছিল তাঁদের প্রধান অন্তরায়।

কাদম্বিনী বসু এম.এ পরীক্ষায় বসেন ১৮৮০-তে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতি নিয়ে। এই সময়েই কাদম্বিনী মেডিকেল পড়তে চেয়েছিলেন এবং সেইসঙ্গে কর্তৃপক্ষকে তা জানিয়েও ছিলেন। কিন্তু মেডিকেল কলেজের অনেকেই মেয়েদের চিকিৎসাবিদ্যা পড়ার বিপক্ষে ছিলেন। তাঁদের আপত্তি প্রধানত কোথায় ছিল তা সুস্পষ্ট হয় কয়েকটি কথায়। তাঁদের প্রথম আপত্তি ছিল, কোনও কারণে শিক্ষার মান কমানো চলবে না। মেয়েদের নাকি চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয়

পড়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, মেয়েরা যদি একান্তই ডাক্তারি পড়তে চায়, তাহলে অন্য কোথাও পড়তে হবে। এমন কী যাঁরা অধ্যাপক তাঁদের পক্ষ থেকে তীব্র আপত্তি দেখা দিয়েছিল এই কারণে যে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে ক্লাস করলে তাঁরা শারীরবিদ্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করবেন কী করে!

কিন্তু কাদম্বিনী বসুর ছিল অদম্য মনোবল। প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করে গেছেন। ঠিক সেই কারণেই কাদম্বিনীদেবী ডাক্তারি পড়ার আগে বেথুন কলেজে বি. এ পড়া অব্যাহত রেখেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন গ্র্যাজুয়েট হওয়া মাত্রই মেডিকেল কলেজে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়। তিনি সেইভাবেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। এভাবেই মহিলাদের চিকিৎসক হওয়ার পেছনে ছিল শত বাধা। সে যুগে সমাজে কিছু সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা মেয়েদের চিকিৎসক হওয়ার পেছনে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন। এমন কী মহিলাদের ডাক্তারি পড়ার আগ্রহ দেখে ১৮৮২-এ ডি.পি. আই চিঠি পাঠালেন কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছে। তাঁদের প্রস্তাব ছিল মেয়েদের প্রবেশিকা পাশ করলেই মেডিকেল পড়বার সুযোগ দেওয়া হোক।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এটাই যে, চিকিৎসক হয়েও নিজের সমাজে যোগ্য মর্যাদা তো দূরের কথা, চিকিৎসা করতে অপমানিত হয়েছেন, বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। বাধ্য হয়ে শেষপর্যন্ত তাঁকে বিদেশে যেতে হয়েছিল বিদেশের ডিপ্লোমা নিয়ে আসতে। সেখানেও তিনি যোগ্যতার সঙ্গে তিন মাসেই ডিপ্লোমা সম্পূর্ণ করেন ১৮৯৩-এ। তখন তিনি পাঁচটি সন্তানের জননী।

কাদম্বিনীকে খ্যাতিলাভে যথেষ্ট বিড়ম্বনা পেতে হয়েছিল। স্ত্রী স্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষ করে তাঁকে 'চরিত্রহীনা' বলে অপবাদ দেওয়া হয়। তাঁর সুযোগ্য স্বামী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সেই অপবাদের তীব্র নিন্দা করেন এবং শুধু কাদম্বিনীর হয়ে নয়, সমগ্র নারী সমাজের পক্ষ থেকে মামলা করেন।

কাদম্বিনী বসুর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে সক্ষম হয়েছিল শুধুমাত্র তাঁর বিবাহিত জীবনের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে পরবর্তী জীবনে স্বামী হিসেবে পাওয়ার ফলে। তাঁর উৎসাহ কাদম্বিনীকে শুধু উপযুক্ত চিকিৎসক করেই তোলেনি, বৃটিশ শাসিত সমাজে সাগরপারে গিয়ে চিকিৎসবিদ্যায় ডিপ্লোমা আনতেও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। তাঁরই প্রেরণায় ইংলণ্ডের মেডিকেল ডাইরেক্টরিতে ১৯০৫-এ কাদম্বিনী গাঙ্গুলির নাম ও পরিচয় গ্রোথিত হয়েছিল।

ভারতীয় মহিলা চিকিৎসকদের পথিকৃৎ বলে আমরা যে তিনজন মহিলার নাম জানি, তাঁরা হলেন বাংলার মেয়ে কাদম্বিনী বসু (গঙ্গোপাধ্যায়), আনন্দবাঈ যোশী ও অ্যানি জগন্নাথন। স্বাধীনোত্তরকালে মহিলাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে পথ অনেক মসৃণ হয়েছে। সুতরাং আজকের দিনে অর্থাৎ সার্ধশতবর্ষের সূচনায় নারী জগতের পক্ষ থেকে কাদম্বিনী গাঙ্গুলিকে স্মরণ করা অবশ্যই কর্তব্য। তাঁর চিকিৎসা পরিষেবাও পরবর্তীদের কাছে অনুসরণীয়। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্তও প্রকৃত চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করে গেছেন। প্রসঙ্গত অবশ্যই উল্লেখ্য, শুধু রোগীর সেবায় নয়, জনগণের সার্বিক সেবা ও দেশমাতৃকার সেবা ও মুক্তি আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তিনি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে চিরদিনই স্মরণীয় ও বরণীয় নিঃসন্দেহে।

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম।। ২০

জেলায় জেলায় হনুমৎ শক্তি জাগরণ মহাযজ্ঞ

‘হিন্দু সন্ত্রাসবাদ’ অপপ্রচারের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ রাজ্য জুড়ে

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় বিভিন্ন ব্লক ও শহরে গত ১২ ডিসেম্বর (২০১০) থেকে নানা ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রীহনুমৎ শক্তি জাগরণ যজ্ঞ ও হিন্দু সম্মেলন হয়ে গেল।

ডায়মণ্ডহারবার শহরে ব্যাণ্ড বাদ্যসহ গঙ্গাবারি আনয়ন করেন কয়েকশো মহিলা। ডোঙারিয়া অঞ্চলে সারাদিন ধরে মেলার পরিবেশ ও সন্ধ্যাতে যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়।

ক্যানিং-এ প্রায় ১০ হাজার মানুষ সারাদিন ব্যাপী কার্যক্রমে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত থেকেছেন।

সবথেকে বড় সম্মেলন হয়েছে বাসন্তী ব্লকের বড়কাছারি মন্দির চত্বরে। সেখানে প্রায় ১২০০০ লোক সারাদিন ধরে যজ্ঞ ও জনসভায় উপস্থিত থেকেছেন।

প্রত্যন্ত দ্বীপ গোসাবা ব্লকের চণ্ডিপুরেও স্থানীয় এলাকায় প্রভাব ফেলার মতো সম্মেলন ও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কয়েকবছর আগের সোনাখালির পরিবেশে যে পরিবর্তন হয়েছে এবারে সেটা দেখা গেল। বিশাল হিন্দু সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শ্রীমদ্ প্রদীপ্তানন্দজী (কার্তিক মহারাজ), রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, গায়েত্রী পরিবার, গৌড়ীয় মঠ ও অন্যান্য মঠ-মন্দিরের সন্ন্যাসীরা। এই জেলায় প্রতিটি ব্লকে কমপক্ষে একটি, কোথাও বা দুই থেকে তিনটি সম্মেলন হয়েছে।

কুলতলি

এই জেলার কুলতলি খণ্ডে ১০ হাজারেরও বেশি গ্রামবাসীর উপস্থিতি ও সহযোগিতায় হোম-যজ্ঞ ও বিশাল হিন্দু সম্মেলন হয়ে গেল। যজ্ঞের প্রসাদ হিসাবে শাল পাতার বাটিতে খিচুড়ি দেওয়া হয়। আশেপাশের হিন্দু সমাজের কাছ থেকে ৮ কুইন্টাল চাল, ৩৭৩ কেজি ডাল ও ৮২ কেজি আদা আলু দান গ্রহণ করা হয়। গ্রামের একজন ব্যবসায়ী দুটি বাস দেয়। সারাদিন ওই বাস ব্যবহার করা হয়। প্রশাসনিক সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য।

কালনা

গত ২৫ ডিসেম্বর বর্ধমান জেলার কালনা শহরের দিপালী সঙ্ঘের মাঠে হনুমৎ শক্তি জাগরণ যজ্ঞ ও হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হনুমান চালিশা পাঠ, মণীন্দ্রলাল ভট্টাচার্য ও মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

যজ্ঞের শেষে হিন্দু ধর্মসভায় পূজ্য সন্ত সোমনাথ ব্রহ্মচারী, কার্তিক ব্রহ্মচারী, কাটোয়া কলেজের অধ্যাপক দয়াময় বিশুই, তপন মণ্ডল, দেবাশিষ ভট্টাচার্য প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সন্ত সোমনাথজী বলেন, প্রায় চার লক্ষ মানুষ ১৫২৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত রামমন্দির নির্মাণ আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছেন যার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দেবাশিষ ভট্টাচার্য। ধর্মসভার শেষে প্রায় দেড় হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করে। হনুমৎ শক্তি জাগরণ সমিতির সভাপতি পরিতোষ সাহা ও সম্পাদক নির্মল দাস বলেন যে শহরের মানুষের সহযোগিতায় এই বিশাল সম্মেলন সম্ভব হয়েছে।

হাওড়ায় হিন্দু সম্মেলন

গত ২৬ ডিসেম্বর হাওড়ায় শ্রীহনুমৎ শক্তি জাগরণ সমিতির উদ্যোগে হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পরিচালিত সারা ভারত হিন্দু মিলন মন্দিরের সংযোজক স্বামী গুরুপদানন্দজী মহারাজ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রামধনী পাণ্ডে এবং আর্য সমাজের এক স্থানীয় বিশিষ্ট কর্মকর্তা। আর্যসমাজের উদ্যোগেই বৈদিক শান্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া মহানগর সহসঙ্ঘচালক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্থানীয় প্রবীণ স্বয়ংসেবক অরুণ চক্রবর্তী।

মালদা ও উত্তর দিনাজপুর

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ এবং মালদা জেলার চাঁচলসহ অন্যান্য এলাকাতেও হনুমৎ শক্তি জাগরণ মঞ্চ -এর উদ্যোগে ১৯টি স্থানে হিন্দু সম্মেলন ও যজ্ঞানুষ্ঠান হয়ে গেল। ১৭ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনের স্থানগুলি হলো মালদা জেলার নালাগোলা, ডোবাখোকসান, গাজোল, শিবাজীনগর, অমৃতির খাকশোনাল, কালিয়াচকের বালিয়াডাঙ্গা, রাজনগরের বেগুনটোলা, মথুরাপুর, পাঁকুয়া হনুমান মন্দির, গোলাপগঞ্জ, হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডী, সাহাপুর ঘোষ পাড়া, গৌড়খণ্ডের মহদীপুর কীর্তন প্রাঙ্গণ বৈষ্ণব নগর। উত্তর মালদাতে বারদুয়ারী, হরিশচন্দ্রপুর, সুর্জাপুর, মালতীপুরের আলাদীপুর ও চাঁচল নগর। উত্তর মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ, ফরাক্কা ও পলাশীতে হিন্দু সম্মেলনে যজ্ঞানুষ্ঠান, হনুমানচল্লিশা পাঠ ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। হিন্দু সম্মেলনের অঙ্গ হিসাবে প্রতিটি স্থানে ২০০-৩০০ জন মহিলাদের কলসযাত্রা, হনুমান পূজা ও সাধুসন্তদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন সভায় বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী, ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার, উত্তরবঙ্গের প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকার, বি এম এসের রাজ্য সভাপতি নীহারেন্দু দত্ত, সঞ্জীব মিশ্র, জলধর মাহাতো, প্রবীর মিত্র প্রমুখ।

প্রতিটি সভাতে বক্তারা জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাস ও কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে, অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মভূমিতে ভব্য মন্দির নির্মাণ ও সঙ্ঘের বিরুদ্ধে হিন্দু সন্ত্রাসবাদের তকমা লাগানোর প্রতিবাদে বক্তব্য রাখেন। প্রতিটি হিন্দু সম্মেলনে ২৫০০ থেকে ৫০০০ পর্যন্ত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

কাঁথি

গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১০ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি সরস্বতীতলায় ‘‘শ্রীহনুমৎ শক্তি জাগরণ সমিতির’’ ব্যবস্থাপনায় হনুমানজীর পূজা ও এক বিশাল হিন্দু সম্মেলন ও ধর্মসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীমতী অঞ্জলি রায়। ধর্ম জাগরণ সমন্বয় সমিতির প্রাদেশিক প্রমুখ সনাতন মাহাতো বক্তব্য রাখেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় প্রচারক অদ্বৈত চরণ দত্ত তাঁর বক্তব্যে কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার সমস্ত পরিকল্পনায় কেন্দ্রে সরকারের নীরবতা, ‘‘গৈরিক সন্ত্রাসবাদ’’ নামে রাষ্ট্রবাদী হিন্দু সংগঠনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও কানুনী ব্যবস্থা ইত্যাদি তুলে ধরেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন কাঁথিনগরের নগরসঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ মাল।

কাঁথিতে হিন্দু সম্মেলন উপলক্ষে মঞ্চাসীন অদ্বৈতচরণ দত্ত, সনাতন মাহাতো, অঞ্জলি রায় ও মৃণ্ময় রথ।

সাতগাছিয়ায় হিন্দু সম্মেলন

রামমন্দির আজ এক জাতীয়তাবাদের প্রতীক। তাই রামমন্দিরের নির্মাণকল্পে সমগ্র দেশবাসীর একাত্ম হওয়া অত্যন্ত জরুরী বলে মন্তব্য করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বর্ধমান জেলা সম্পাদক ডাঃ চিন্ময় দত্ত। গত ২৬ ডিসেম্বর বর্ধমান জেলার সাতগাছিয়াতে অনুষ্ঠিত এক হিন্দু সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডাঃ দত্ত এই মন্তব্যের পাশাপাশি আরও বলেন যে, রামজন্মভূমিতেই রামমন্দির নির্মাণের যে ঘোষণা এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ কর্তৃক হয়েছে তা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষিতে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

এদিন সকাল দশটা থেকে পূজা-পাঠ, যজ্ঞসহ খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ হয়। ওই অঞ্চলের প্রায় হাজারজন গ্রামবাসী অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বর্ধমান জেলার বিশ্বহিন্দু পরিষদের সভাপতি রাধাগোবিন্দ হেঁস-সহ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। দেশজুড়ে ঘটে চলা সন্ত্রাসবাদ এবং কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে কেন্দ্র সরকারের টালবাহানা বিষয়ে বক্তরা বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় মানুষের সার্বিক সহযোগিতায় সম্মেলন সফল হয়।

ডুমুরদহ উত্তম আশ্রম

হনুমৎশক্তি জাগরণ সমিতি, বলাগড় প্রখণ্ডের পরিচালনায় গত ৫ ডিসেম্বর সারাদিন ব্যাপী ডুমুরদহ উত্তম আশ্রমে শ্রীরাম জন্মভূমির উপর অযোধ্যায় ভব্য মন্দির নির্মাণ কল্পে ‘হনুমৎ শক্তি জাগরণ মহাযজ্ঞের’ আয়োজন করা হয়। সমবেত ওঁকার ধ্বনির মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রদ্ধেয় স্বামী শ্রীমৎ তিতিক্ষানন্দ মহারাজ। বেদ পাঠ করেন প্রণবেশানন্দ মহারাজ।

যজ্ঞের প্রারম্ভে শ্রীরামচন্দ্র ও হনুমানজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন মঞ্চে উপস্থিত সাধু সন্তগণ। উপস্থিত সাধুসন্ত ও কার্যকর্তাদের মাল্যদান করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বলাগড় প্রখণ্ডের সম্পাদক তপন মুখার্জী ও হনুমৎ শক্তি জাগরণ সমিতির সংযোজক সুভাষ সাধুখাঁ। শ্রী হনুমান চালিশা পাঠ করেন শ্রীমৎ তিতিক্ষানন্দ মহারাজ ও বক্তৃতায় হিন্দু ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও হিন্দু সংগঠনের উপর আলোকপাত করেন স্বস্তিকার ব্যবস্থাপক অভিজিৎ রায়চৌধুরী। প্রসাদ বিতরণের পর এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আনুড়ে হিন্দু সম্মেলন

গত ২৬ ডিসেম্বর হুগলী জেলার সীমান্ত গ্রাম আনুড়-এ হিন্দু সম্মেলন হয়ে গেল। সারাদিন ধরে হোম-যজ্ঞ, ধর্মীয় শোভাযাত্রা ও জনসভা হয়। আয়োজিত যজ্ঞে প্রায় ২০০০ মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন কামারপুকুর কলেজ ও আনুড় বি এড কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ বিনয় মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শক্তিপদ পাল, স্বস্তিকার সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য, স্থানীয় রামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রমের স্বামীজী প্রমুখ। আশেপাশের দশ-বারোটি গ্রামের মানুষ এই হিন্দু সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

গোপীবল্লভপুরে হনুমৎ শক্তি জাগরণ মহাযজ্ঞ।

গোপীবল্লভপুর

গত ১৯ ডিসেম্বর হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন হনুমৎ শক্তি জাগরণ সমিতির ঝাড়গ্রাম জেলা সম্পাদক সুবর্ণ পাণ্ডে ও সঙ্ঘের মেদিনীপুর বিভাগ সহ-সঙ্ঘচালক অমলেন্দু দাস এবং দক্ষিণবঙ্গ সহ-প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অবনী কুমার ঘোষ।

ভারতবর্ষে ক্রীড়াক্ষেত্রেও অগ্রদূত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের মতো ক্রীড়াক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অগ্রদূত। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের। তাঁর চিন্তা ও বাণীর মর্মোদ্ধার করতে পারেনি এদেশের ক্রীড়াকর্তারা। যদি তা পারতেন তা হলে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের চেহারা ও চরিত্রটাই বদলে যেত। এশিয়াড থেকে অলিম্পিয়াড সর্বত্র দিকচক্রবাল আলো করে থাকত ত্রিবর্ণরঞ্জিত জয়পতাকা। আর তা দেখে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের বিমূর্ত আত্মা তার চিরন্তন স্বপ্নের ভারতগৌরবে চরম গর্ব অনুভব করতেন। কারণ তিনিই যে ভারতবর্ষের সনাতন বৈদিক শরীর।

এহেন বিবেকানন্দ তার যৌবনে সমস্তরকম খেলা ও শরীরচর্চা করেছেন। বিশ্ববিখ্যাত মল্লবীর যতীন্দ্রনাথ গুহ (গোবর) প্রতিষ্ঠিত ব্যায়ামাগারে রীতিমতো নাড়াবেঁধে ব্যায়াম কসরত করেছেন। শিখেছেন লাঠি, তরোয়াল, বন্দুক চালানো। হিন্দুমেলায় তা প্রদর্শিত করেছেন। আর ক্রিকেটার স্বামীজীর কথা সকলেরই জানা। তৎকালীন বাংলা ক্রিকেটে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ক্যালকাটা ও টাউন ক্লাব। ক্যালকাটা ক্লাব ছিল পুরোদুস্তর ইংরাজ ক্রিকেটারদের দল যা বৃটিশ আভিজাত্যের ধবজা বহনকারী। আর টাউন ক্লাব ছিল বাঙালির আশা-ভরসার প্রতীক। বাংলার ক্রিকেটের আতুঁড়ঘর।

এই টাউনক্লাব ক্যালকাটা ক্লাবের বিরুদ্ধে লিগের অতি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামার আগে স্বামীজী তথা নরেন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হয়েছিল। তারা খবর পেয়েছিল নরেন্দ্রনাথের ক্রিকেটীয় দক্ষতার। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুবক নরেন্দ্রনাথ কয়েকদিন ক্লাবের নেট প্র্যাকটিসে আসেন ও ফাস্ট বোলিংয়ের উৎকৃষ্ট নমুনা পেশ করে ক্লাবকর্তাদের দুশ্চিন্তা মুক্ত করেন। তারপর এল সেইদিন যেদিন ময়দানে মুখোমুখি দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী। টাউনক্লাব টসে জিতে ফিল্ডিং নেয়। নরেন্দ্রনাথ বোলিং আক্রমণ শুরু করেন এবং অচিরেই তার আগুন পেসে ঝলসে যায় বাঘা বাঘা ইংরাজ ব্যাটসম্যান। মাত্র ৩০ রানে সাত উইকেট নিয়ে একশোর সামান্য বেশি স্কোরে গুটিয়ে যায় ক্যালকাটা। অনায়াসেই সেই ম্যাচ জিতে নেয় টাউন। তার অসাধারণ পেস ও সুইং বোলিং পরবর্তীকালে বাঙালি জোরে বোলারদের নানাভাবে উদ্দীপ্ত করেছে। তা এই প্রতিবেদক অনেক বছর বাদে টাউনক্লাবে খেলার সূত্রে জানতে পেরেছে।

তিনিই বলেছিলেন বাঙালি তথা ভারতীয় যুবকদের গীতাপাঠ না করে ফুটবল খেলতে, কারণ— ফুটবল খেললে স্বর্গ ও সত্য পুরোপুরি আয়ত্ত হয়। স্কুল, কলেজে দাপটের সঙ্গে ফুটবল খেলেছেন, তবে ক্লাব ফুটবল খেলেননি। কিন্তু তাঁর ফুটবল দর্শন ও বাণী ১৯১১-র ঐতিহাসিক শিল্ড জয়ী

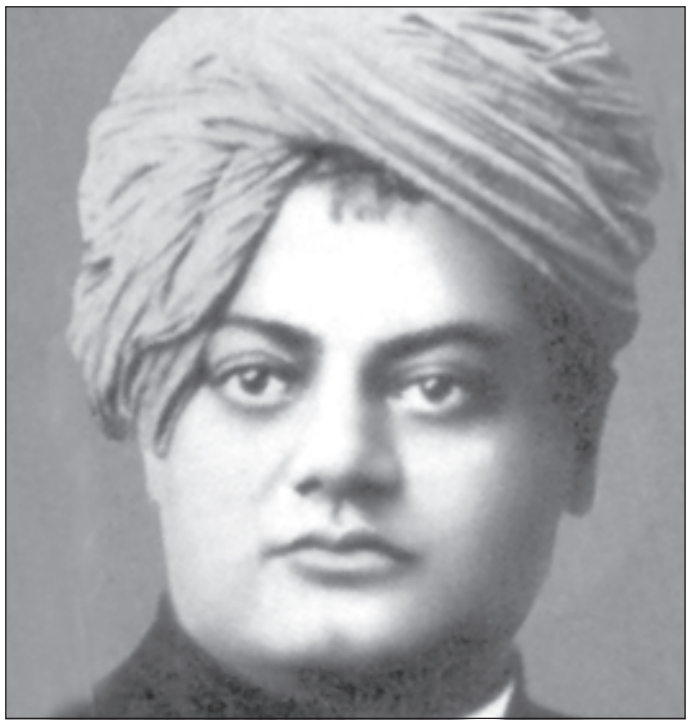

মোহনবাগান ফুটবলারদের এতটাই অনুপ্রাণিত করেছিল যে ১৯৪৭-এর অনেক আগেই বাঙালির প্রতীকী স্বাধীনতা অর্জিত হয়ে যায়। আমেরিকায় তার গলফ ও শ্যুটিং দক্ষতা ও প্রতিপক্ষ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছিল আম-জনসমাজ। এমনও মন্তব্য করা হয়েছিল তৎকালীন বিখ্যাত সব মার্কিন পত্রপত্রিকায় যে এই দুটি খেলা যদি তিনি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহ খেলতেন ও পেশা হিসেবে নিতেন তাহলে একাধিক অলিম্পিক পদক আসতো ভারতে।

তাই বলতে হয় স্বামী বিবেকানন্দ খেলার মাঠেও জীবনের চেয়ে বড় জীবনবৃত্ত রচনা করতে পেরেছিলেন। আর তা অবশ্যই তার অতিমাত্রিক বিভূতির বলে নয়। ছোটবেলা থেকে নানা খেলাচর্চা ও খেলার প্রতি আবেগ ও ভালবাসাই তাকে সব খেলায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিল। আর খেলাই যে জীবন শিক্ষার সূতিকাগার। তাই দেশের যুবকদের সবসময় খেলা ও শরীরচর্চার মধ্যে থাকতে বলেছেন, উদ্দীপ্ত করেছেন নিজের দৃষ্টান্ত ও দক্ষতার প্রতিফলনের মাধ্যমে।

শব্দরূপ - ৫৬৭

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

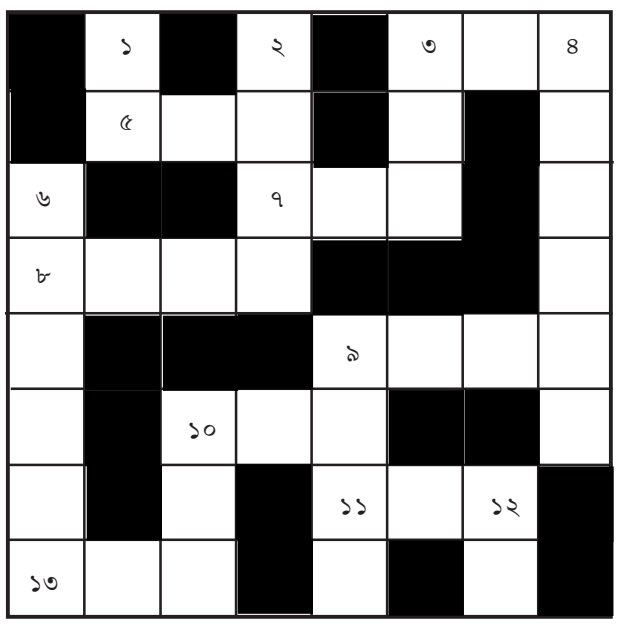

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ৩. বড় লেবু বিশেষ, প্রথম দু'য়ে পাতলা বাখারি, ৫. পক্ষী বিশেষ, (প্রবাদ—জ্যোৎস্না পান করে), ৭. এই অপ্সরা ছিলেন শকুন্তলার জননী, ৮. সার্বভৌম নরপতির যজ্ঞবিশেষ, ৯. যাহার পূর্বজন্মের ঘটনা স্মরণে আছে, ১০. যাহার চ্যুতি বা পরিবর্তন নাই;কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ১১. চৌদ্দ অক্ষরে রচিত দুই চরণবিশিষ্ট বাংলা পদ্যের ছন্দ, ১৩. ছারপোকা;আগাগোড়া কৌতুক, মজা।

উপর-নীচ ঃ ১. বৃহস্পতির পুত্র, শুক্রের শিষ্য, ২. কুকুর, ৩. ছোট বাড়ি, ৪. রামায়ণোক্ত লতাবিশেষ যাহা শল্যব্যথা দূর করে, ৬. প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ, ৯. কোষ্ঠী, জন্মপত্রিকা, ১০. অতনু, মদন, ১২. কদলী অর্থে অপ্সরা।

● ৫৬৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩১ জানুয়ারি, ২০১১ সংখ্যায়

অ্যাথলেটিক্সই ভারতের রক্ষাকবচ হয়ে উঠবে

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। কমনওয়েলথ ও এশিয়ান গেমসের এই সাফল্য কি দেশের ক্রীড়া সংস্কৃতিকে নতুন দিশা দেখাবে? সব খেলার আঁতুড়ঘর অ্যাথলেটিক্স ও জিমনাস্টিক্স কি ফিরে পাবে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি? এই প্রশ্নের নিরসন হওয়াই নতুন বছরে একমাত্র অবলম্বন, ভারতবর্ষের ক্রীড়া আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রেখে তা আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে। আর তাই এদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের মানসিকতায় বদল আশু কাম্য। সক্রিয় উদ্যোগী হতে হবে বাণিজ্যিক সংস্থা, গণমাধ্যম সবাইকেই। অ্যাথলেটিক্স, জিমনাস্টিক্স, সাঁতার যে শুধু সব খেলার জীবনভিত্তি শুধু তাই নয়, এই তিনটি খেলায় সবচেয়ে বেশি পদকও জুড়ে রয়েছে।

দিল্লি কমনওয়েলথ গেমসেই বোঝা গেছিল ভারতের অ্যাথলেটিক্স আবার জেগে উঠতে চলেছে। ১৯৫৮-এ শেষবার কমনওয়েলথ গেমসের ট্রাক থেকে সোনা অর্জিত হয়েছিল। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বহু কীর্তিখ্যাত অ্যাথলিটের গৌরব গরিমায় অলোকিত হয়েছে ভারতীয় ক্রীড়া সমাজ। কিন্তু কমনওয়েলথ গেমস থেকে সোনা ফলানো যায়নি। সেই শূন্যতা হতাশা এবারই দূর হলো দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামের সুশোভিত ট্রাকে। কৃষ্ণা পুনিয়া ডিসকাসে রেকর্ড করে সোনা জিতলেন। তারপর ৪৪০০ মিটার রিলেতে মেয়েরা আবার বিজয়মঞ্চে তুলে ধরলেন ভারতবর্ষকে।

সেই সাফল্যের ধারা ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে চীনে, এশিয়াডের ট্রাকেও। সৌজন্যে অবশ্যই মহিলারা। পাঁচটির মধ্যে চারটি সোনা এসেছে তাদের সৌকর্যে। কৃষ্ণা সোনা জিততে না পারলেও উঠে এসেছেন নতুন নক্ষত্ররা। অশ্বিনী চিদানন্দ, কবিতা রাউত, পূজা শ্রীধরনরা মনে করিয়ে দিয়েছেন অ্যাথলেটিক্সে ভারতের সোনালী অধ্যায়ের দিকচক্রবাল। পি টি উষা, সাইনি আব্রাহাম-দেরই প্রতিচ্ছবি দেখা গেছে গুয়াংঝৌর ট্রাকে। আর রিলে দৌড়ে ভারতের যে আভিজাত্য ও ঐতিহ্যের গরিমা তা এবারও খুন্ন হয়নি মনপ্রীত, মনজিৎ, অশ্বিনীদের দাপটে। সবেধন নীলমণি জোসেফ আব্রাহাম পুরুষদের জয়ধবজা উড়িয়েছেন হার্ডলসে

খেলার জগৎ

সোনা জিতে। অ্যাথলেটিক্সের এই প্রাপ্তি অবশ্যই ভারতীয় ক্রীড়ামানসে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করবে। তরুণ প্রজন্ম আরও বেশি করে ট্রাকমুখী হবে। এশিয়াডে পাঁচটি সোনা ছাড়াও সব মিলিয়ে ১২টি পদক উঠে এসেছে অ্যাথলেটিক্সের দৌলতে। যা দিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেছে চীন, জাপান, কোরিয়ার মতো দেশেও। ঠিক তেমনই সাঁতার, জিমনাস্টিক্স থেকেও পদক প্রাপ্তি ভবিষ্যতের পক্ষে ইঙ্গিতবাহী। জিমনাস্টিক্সে এবারই প্রথম পদক এল আশীষ কুমারের হাত ধরে। আশীষ দিল্লিতেও ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। সাঁতারে তবু শচীন পাল, খাজান সিংহরা আগে এশিয়াড পদক জিতেছেন। কিন্তু আশীষ জিমনাস্টিক্সে খাতা খুলে ভারতীয় জিমনাস্টিক্সকে সাবালক করে দিয়েছেন।

বেজিং অ্যাথলেটিক্সই এশিয়াডে ভারতের মুখ রক্ষা করেছে। ১৪টি সোনা সহ ৬৪টি পদক জয়ে তাই বক্সার, অ্যাথলিটরাই নেপথ্য নায়ক। ১৫টি সোনা সহ ৮০টি পদকের টার্গেট নিয়ে ভারত এশিয়াডে গেছিল। সোনার ক্ষেত্রে টার্গেট ছুঁয়ে ফেলা গেছে প্রায় কিন্তু শ্যুটারদের ব্যর্থতায় ৮০টি পদক হলো না। তবে শ্যুটিং নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। সারা বছর ধারাবাহিকভাবে ভাল পারফর্ম করেছে যারা, তাদের একটা সিটে ব্যর্থতা দেখে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। অবশ্যই গগন নারাং, অভিনব বিন্দ্রা, মানবজিৎ সিংসাম্পুরা বিশ্বমানের শ্যুটার। ঠিকমত অনুশীলন হয়নি বলে চীনের মাটিতে এদের রূপো, ব্রোঞ্জ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। ভবিষ্যতে তারা দেশকে গর্বিত করবেন, আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন ভারতীয় শ্যুটিংকে, কোনও সংশয় নেই।

আর এবারের এশিয়াডে একটা সত্য পরিস্কার করে দিয়েছে বিদেশী কোচের কোনও বিকল্প নেই। হয়তো হকি এবং ফুটবলে বিদেশী কোচের হাতে পড়ে কিছুমাত্র উন্নতি হয়নি। কিন্তু অ্যাথলেটিক্স বক্সিংয়ের এই উত্থানকে ধরে রাখতে গেলে অবশ্যই বিদেশী কোচকে ধরে রাখতে হবে। অ্যাথলেটিক্সে ইউক্রেন ও বক্সিংয়ে কিউবান কোচ যে আন্তরিকতা, অধ্যবসায় ও টেকনিকাল জ্ঞান দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন ভারতীয়দের, তাকে কুর্নিশ না করলে অন্যায় করা হবে। ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের মধ্যে প্রতিভা ও দক্ষতার কোনও ঘাটতি নেই। অভাব সেই দক্ষতার সঠিক রূপায়ণ ও লড়াকু, ইস্পাতকঠিন অথচ লক্ষ্যে একবগ্গা মানসিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলা। ঠিক এই ছকটাই করে গেছেন বিদেশী কোচ, ট্রেনাররা। তাই কমনওয়েলথ থেকে এশিয়াড সর্বত্র ঝলমল করেছেন ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স, বক্সার বা অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃতবিদ্যরা।

দেশভাগে লাভবান কংগ্রেস দেশভাগে ইন্ধন যোগাচ্ছে আবারও

শিবাজী গুপ্ত

১৯০৯-২০০৯ : পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার শতবর্ষ। তার তিন বছর আগে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং জন্মক্লেদ না শুকাতেই দুই মাসের মধ্যেই তার ভাবী চরিত্র ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর পরিচয় প্রদান করেছে কুমিল্লার (অধুনা বাংলাদেশ) হিন্দুদের উপর। বিলাতের সমকালীন 'Manchester Guardian' পত্রিকায় সে বীভৎস অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া যায় : "...Lives were lost, temples deserated, images broken, shops plundered and many Hindu widows carried off... women spent nights hidden in tanks and the crime as 'group rape' increased..."

অর্থাৎ হিন্দুরা প্রাণ হারিয়েছে, তাদের মন্দির অপবিত্র করা হয়েছে, ঠাকুর-দেবতার মূর্তি ভেঙেছে, দোকানপাট লুণ্ঠিত হয়েছে এবং বহু হিন্দু বিধবা নারীকে তুলে নিয়ে গেছে...রাতের পর রাত হিন্দু মহিলারা পুকুরে রাত কাটিয়েছে এবং 'গণ-ধর্ষণ' নামক অপরাধ বেড়েছে...।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার দুই মাস আগে ১৯০৬ সালের পয়লা অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে মুসলমান নেতারা বড়লাট লর্ড মিন্টোর কাছে যে ডেপুটেশন দেয়, তার মুখ্য দাবীই ছিল— "They should be given the right of sending their own representatives through separate communal electorates."

বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী মুসলমানদের এই সাম্প্রদায়িক বিভেদপন্থী দাবী মেনে নিতে দেরী করল না। ১৯০৯ সালের 'মর্লে-মিন্টো রিফর্মসে' মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ঘোষণা করে তাদের মনোরঞ্জন করতে ভুল করল না। হিন্দু-মুসলমানে ধর্ম-সংস্কৃতি ও জাতিগত ঐক্য কখনোই ছিল না। ভবিষ্যতে যাতে রাজনৈতিক ঐক্যও গড়ে না ওঠে তার সম্ভাবনা তার অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে রাখল। তৎকালীন হিন্দু নেতারা— পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, গোপালকৃষ্ণ গোখলে তো বটেই, শুনতে অবাক লাগবে, মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নাও জাতির ঐক্য ও সংহতি বিনাশকারী এই পৃথক নির্বাচন প্রথার নিন্দা করেছিলেন।

কিন্তু পাঁচ ছ' বছর না যেতেই কংগ্রেসী নেতাদের বদলে গেল মতটা। জিন্না মুসলিম দলে যোগ দিলেন এবং জাতীয়তাবাদী আচকান ফেলে সাম্প্রদায়িক চাপকান পরলেন। অনেকটা ইংরেজের সুরেই মুসলমানদের দাবী-দাওয়া তুলতে লাগলেন। তিলক, সুরেন ব্যানার্জী, অ্যানি বেসান্ত প্রমুখ নেতারা লীগের দাবীমতো ইংরেজের দেওয়া পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা তো স্বীকার করে নিলেনই, প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদের সংখ্যানুপাতে প্রাপ্য আসনের উপর ধরতি বা ফাও হিসাবে আরও বেশি আসন দেবার স্বীকৃতি জানিয়ে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। হিন্দু-মুসলিম মিলন নামক সোনার হরিণের পেছনে ছুটে কংগ্রেস নেতারা হিন্দুদের এই ক্ষতিসাধন করলেন।

বৃটিশ সরকার যখন দেখল কংগ্রেস নেতারা মুসলমানদের মন জোগাতে হিন্দুদের পায়ে কুড়াল মারতে রাজী, তখন হিন্দুদের কোমর ভেঙে মুসলমানদের চিরতরে হিন্দুদের কাছ ছাড়া করে বৃটিশের বশংবদ ভৃত্য হিসাবে টেনে রাখতে তারাও পিছিয়ে থাকবে কেন— বিশেষতঃ ব্যাপারটা যখন হিন্দুদের কাঁধে বন্দুক রেখেই করা যাবে। এলো কম্যুনাল এওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ—১৯৩৩।

তার দৌলতে মুসলমানরা জনসংখ্যার শতকরা ২৫ জন হয়েও কেন্দ্রিয় আইন সভায় শতকরা ৩৩টি আসন পাবে। বাংলার অবস্থা আরও শোচনীয়। এখানে শতকরা ৫৪ জন মুসলমান পেল ১১১টি আসন, আর শতকরা ৪৪ জন হিন্দু পেল মাত্র ৮০টি আসন। এই বৈষম্যমূলক আচরণের কোনও ব্যাখ্যা বৃটিশ সরকার দিল না। গান্ধীজী তফশিলী হিন্দুদের আলাদা নির্বাচনের বিরুদ্ধে উপোস করলেন এবং লেবুর রস খেয়ে উপবাস ভাঙলেন, কিন্তু বাংলার বর্ণ হিন্দুদের উপর যে অবিচার করা হলো, তার বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করলেন না। করবেনই বা কেন? মুসলমানদের তোয়াজ করার যে নীতি কংগ্রেস অনুসরণ করে আসছে, বৃটিশ সরকার তো তারই অনুকরণ করেছে। বাংলায় যাতে চিরস্থায়ী মুসলিম শাসন কায়েম হয় এবং হিন্দুরা যাতে ইহজীবনে রাইটার্স বিল্ডিং-এর ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে তারই ব্যবস্থা হলো এই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে। মুসলমানদের এই পোয়াবারো প্রাপ্তির পরিণতি ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগ। ভারতমাতাকে তিন টুকরো করে পশ্চিমা মুসলমানরা এক টুকরো নিয়ে পাড়ি দিল করাচী, আর পূর্বাঞ্চলের মুসলমানরা এক টুকরো নিয়ে চলে গেল ঢাকায়।

> **দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্য বৃটিশ শাসককে নিন্দা করা হয়, সেই দ্বিজাতিতত্ত্বকে আরও উদারভাবে স্বাধীন ভারতে প্রয়োগ করে (জন্ম থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত, ভায়া হজযাত্রা) মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য নেহরু-গান্ধী গোষ্ঠীকে ফুলের মালার পরিবর্তে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করাই কি সঙ্গত নয়!**

কিন্তু এতো হানাহানি রক্তারক্তির এবং দেশভাগের পরেও যুক্ত-নির্বাচনের বাই কংগ্রেসীদের ছাড়ল না। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে যুক্ত-নির্বাচনের ব্যবস্থা হলো এবং যুক্ত-নির্বাচন যে অভিশাপরূপে হিন্দুদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং বৃটিশ সরকার যে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে হিন্দুদের বাঁচার পথ দেখিয়েছে তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলাই ভালো।

পৃথিবীর কোনও সভ্যদেশে নাগরিকদের জন্য দুটি আইনের বিধান নেই। ব্যতিক্রম একমাত্র 'ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত'। এখানে দুটি প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্য দু'ধরনের পারিবারিক আইনের বিধান রয়েছে। হিন্দুদের জন্য পরিবার ছোট করার, জনসংখ্যা কমাবার জন্য কত রকমের আইন, কত রকমের প্রলোভন, তার ফলে দ্রুতহারে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। অপর দিকে পৃথক পারিবারিক আইন ও শরিয়তের দোহাই দিয়ে মুসলমান সমাজে চলছে অসংযত হারে সন্তান উৎপাদন। মসজিদে মাদ্রাসায় চলছে অধিক সন্তান উৎপাদনের ফতোয়া, পরিবার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জেহাদ, পোলিও খাওয়াবার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা। তার ফলে মুসলিম সমাজে ঘটছে জনবিস্ফোরণ। জেহাদী সন্ত্রাসীদের বোমা বিস্ফোরণের চেয়ে মুসলমান সমাজে জনবিস্ফোরণ আরও বেশী বিপজ্জনক। কারণ, তা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের গোপন অস্ত্র বিশেষ। মাথা গুনতি হিসাবে যেখানে ভোটের ফলাফল নির্ধারিত হয়, সেখানে মাথার সংখ্যা বাড়িয়ে ভোটের সংখ্যা বাড়াবার প্রবণতা থাকবেই। মুসলমান রাজনৈতিক ও সমাজ নেতারা পৃথক পারিবারিক আইনের সুযোগ নিয়ে সেই কাজটি করে যাচ্ছেন সুচারুভাবে এবং ফলও পাচ্ছেন হাতে হাতে। ১৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচনে ৫টি মুসলমান আসন (বিধানসভায়) বেড়ে বর্তমানে ১৫টিতে দাঁড়িয়েছে। আগামী নির্বাচনে তার ফল হবে আরও ভয়াবহ। মুসলমানদের হাতে চলে যাবে পশ্চিমবঙ্গ শাসনের চাবিকাঠি। একটি সীমান্ত রাজ্যের পক্ষে তা মোটেই সুখকর নয়।

ইংরেজরা আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে মেনে নিয়েও বলা যায় যে, তারা হিন্দু-মুসলমানে পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করে হিন্দুদের আত্মরক্ষার পথ প্রদর্শন করে গেছে। কিন্তু স্থূলবুদ্ধি হিন্দু নেতারা স্বেচ্ছায় সে সুযোগ নষ্ট করে এখন ভোটে জেতার আশায় নির্লজ্জভাবে মুসলিম ভোটারদের 'কদমবুসি' করছে এবং তথাকথিত সংখ্যালঘুর নামে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা সমেত প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে দেশকে ১৯০৯ সালে ফিরিয়ে নিতে চাইছে। হিন্দুদের বড় শত্রু তাহলে কে— বিদেশী শোষক, না স্বদেশী শাসক?

দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্য বৃটিশ শাসককে নিন্দা করা হয়, সেই দ্বিজাতিতত্ত্বকে আরও উদারভাবে স্বাধীন ভারতে প্রয়োগ করে (জন্ম থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত, ভায়া হজযাত্রা) মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য নেহরু-গান্ধী গোষ্ঠীকে ফুলের মালার পরিবর্তে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করাই কি সঙ্গত নয়! এরা হিন্দু জাতি ও ভারতের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছে, আরও ক্ষতিসাধনের জন্য কোমর বাঁধছে। ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের বদলে ইটালিয়ান কংগ্রেসের দেশ শাসনের কোনও অধিকার নেই।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই-এর ডাক বিদ্যার্থী পরিষদের জাতীয় সম্মেলনে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২৫ থেকে ২৮ ডিসেম্বর কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৫৬ তম রাজ্য সম্মেলন। পরিষদের বিদায়ী সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণুদত্ত শর্মা এবং সভাপতি মিলিন্দ মারাঠের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সূচনা হয় সম্মেলনের। ব্যাঙ্গালোরের বিভিন্ন কলেজের হাজারখানেক ছাত্র-ছাত্রীর কণ্ঠে বন্দেমাতরম গান সম্মেলনের সূচনালগ্নে অন্যমাত্রা যোগ করেছিল। পরিষদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্থানীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে সারা দেশ থেকে প্রায় ৮০০০ ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি ছিলেন ৩ জন মহিলাসহ ১৪৫ জন। এরাজ্যের সভাপতি রবি রঞ্জন সেন ও সম্পাদিকা পারুল মণ্ডল যথাক্রমে সর্বভারতীয় সহ সভাপতি হিসেবে পুনঃমনোনীত ও সর্বভারতীয় সম্পাদিকা হিসেবে নবমনোনীত হয়েছেন। এছাড়াও প্রাদেশিক সংগঠন সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী, যুগ্ম-সংগঠন সম্পাদক সঞ্জয় মণ্ডল, অর্পণ পাল, কিশোর বর্মন, অম্বর সিং সুনওয়ার, কান্তি মুখপু, জ্ঞানেশ্বর রাম জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য হিসেবে

পরিষদের সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন রামা জয়েশ, তাঁর বাঁ দিকে মিলিন্দ মারাঠে, উমেশ দত্ত শর্মা ও অন্যান্যরা।

উপাচার্য ডঃ কে নারায়ণ গৌড়া। সম্মেলনে পরিষদের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে মিলিন্দ মারাঠে পুনর্নির্বাচিত এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে উমেশ দত্ত শর্মা নবনির্বাচিত হয়েছেন। সম্মেলনে শ্রী মারাঠে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুবসমাজকে আহ্বান জানান। রাজ্যসভার সদস্য তথা পাঞ্জাবের হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রামা জয়েশ গত ২৬ ডিসেম্বর সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক মনোনীত হয়েছেন। শিক্ষা ও পরিবেশ সংক্রান্ত দু'টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়াও রাজ্য সম্পাদিকা এবং সর্বভারতীয় সম্পাদিকা পারুল মণ্ডল 'কেন্দ্রীয় সরকারের মিথ্যাচার : নজর ঘোরানোর জন্য হিন্দু সন্ত্রাসবাদের ধুয়ো' শীর্ষক একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। সেইসঙ্গে শ্রীরাম জন্মভূমিতে রামমন্দির নির্মাণ, স্যার বিশ্বেশ্বরাইয়ার সার্ধশতবর্ষ ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তির ওপর তিনটি সংক্ষেপ-প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

Swastika
10 January - 2011, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় হিন্দু সম্মেলনে রামমন্দির নির্মাণের শপথ

সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও হনুমৎ শক্তি জাগরণের কর্মসূচী পালিত হয়েছে প্রতিটি জেলায়।
এই কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যে অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। তারই কিছু ঝলক স্বস্তিকা'র পাতায়। (পূর্ণাঙ্গ খবর ১৩ পাতায়)

গত ২৬ ডিসেম্বর বর্ধমানে হনুমৎ শক্তি মহাযজ্ঞ।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তীতে হিন্দু সম্মেলনে যোগদানকারী মা-বোনেরা।

গত ২৫ ডিসেম্বর বর্ধমানের কালনায় বক্তব্যরত সোমনাথ ব্রহ্মচারী।

হিন্দু সম্মেলন উপলক্ষে কলকাতার খিদিরপুরে ভূ-কৈলাশের মাঠের সন্নিকটে কলসযাত্রা।

গত ২৬ ডিসেম্বর হাওড়ায় হিন্দু সম্মেলন উপলক্ষে বক্তব্যরত স্বামী গুরুপদানন্দ।

উত্তর দিনাজপুরের সুফলগঞ্জ-এ বিরাট হিন্দু সম্মেলনের মঞ্চে সাধু-সন্তরা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক : বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ : সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স : ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@gmail.com / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com